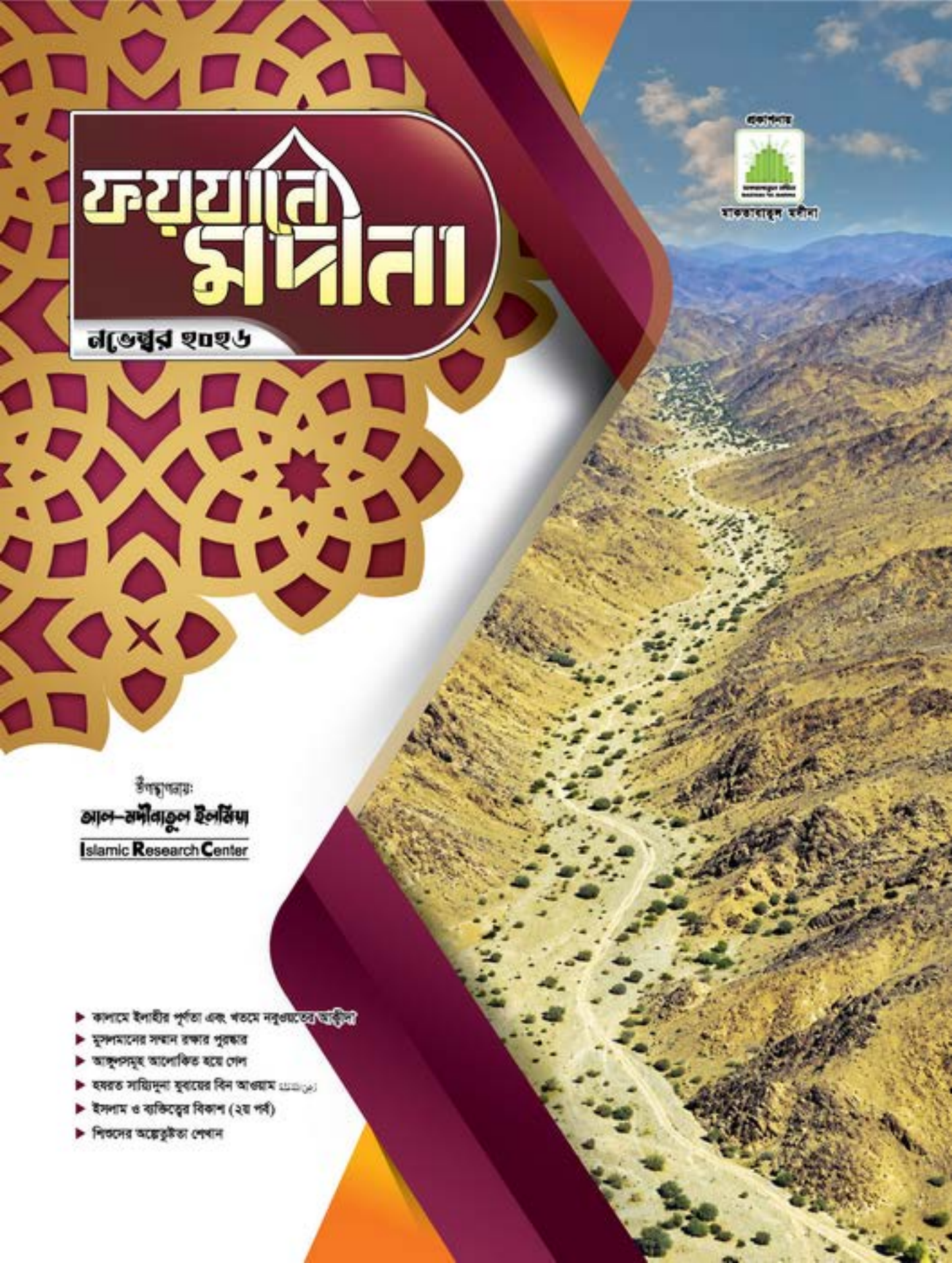
# ফয়যানে মদীনা

নভেম্বর ২০১৬



প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা


উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া

Islamic Research Center



- কালামে ইলাহীর পূর্ণতা এবং খতমে নবুওয়াতের আকীদা
- মুসলমানের সম্মান রক্ষার পুরস্কার
- আত্মাসমূহ আলোকিত হয়ে গেল
- হযরত সায়্যিদুনা যুবায়ের বিন আওয়াম
- ইসলাম ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ (২য় পর্ব)
- শিশুদের অন্তেষ্টিক্রিয়া শেখান

# ফয়যানে মদীনা

নভেম্বর ২০১৬

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন



# কালামে ইলাহীর পূর্ণতা এবং খতমে নবুওয়তের আক্বীদা

মাওলানা আবুন নূর রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

খতমে নবুওয়তের আক্বীদা ইসলামের মৌলিক ও অকাট্য আক্বীদাসমূহের অন্যতম। কুরআনুল করীম যেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' হিসেবে ঘোষণা করেছে, সেখানে বিভিন্ন বাচনভঙ্গি ও বহুবিধ স্থানে এমন সব মূলনীতিও বর্ণনা করেছে, যা তাঁর খতমে নবুওয়তের উপর অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য দিক হলো; দ্বীনের পূর্ণতা, আল্লাহ পাকের বাণীসমূহের পরিপূর্ণতা ও সমাপ্ত হওয়া, ওহীয়ে ইলাহী সংরক্ষিত থাকা এবং তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অস্বীকৃতি সম্পর্কিত কুরআনী বক্তব্য। এই আয়াতসমূহকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেখলে এই চিরন্তন সত্যটি উদ্ভাসিত হয় যে, আল্লাহ পাক তাঁর সর্বশেষ রাসূল হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রেরণের মাধ্যমে হেদায়েতের দ্বীনকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়েছেন, স্বীয় সর্বশেষ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এই হেদায়েতকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সুরক্ষিত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ পাকের চিরাচরিত সুন্নাত ছিল যে, বিভিন্ন যুগে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তাশরীফ এনেছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বাণী বান্দাদের নিকট পৌঁছাতে থেকেছে। মৌলিক আক্বীদা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, তাঁর ইবাদত এবং তাঁর রাসূলগণের আনুগত্য, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর দাওয়াতের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল; যদিও বিভিন্ন যুগ, জাতি ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কিছু শরয়ী বিধানে ভিন্নতা ছিল। যেমনটি কুরআনুল করীম আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতকে এক উম্মত এবং এক মৌলিক দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত করেছে। কিন্তু নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা যখন নিজের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হলো এবং রাসূলে আকরাম হযরত

মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁর বিশ্বজনীন রিসালাতের মাধ্যমে দ্বীনকে এমন এক সর্বব্যাপী পূর্ণতা দান করলেন যার পর কোনো নতুন নবী বা নতুন শরীয়তের প্রয়োজন অবশিষ্ট রইল না।

কুরআনুল করীম ফুরক্বানে হামীদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (পারা: ৬, সূরা: মায়েদা: ৩)

কুরআনুল করীম দ্বীন এবং কালামে ইলাহীর পূর্ণতার বিষয়টি বহু স্থানে উল্লেখ করেছে; যেমনটি সূরা আনআমে রয়েছে:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۱۵﴾

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ সত্য এবং ন্যায়ের দিক দিয়ে তাঁর বাণীসমূহের কেউ পরিবর্তনকারী নেই এবং তিনিই শ্রবণকারী, জ্ঞানী।

(পারা: ৮, সূরা: আনআম: ১১৫)

এই আয়াত মুবারাকায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে: প্রথমত, আল্লাহ পাকের কালেমা অর্থাৎ ওহী ও শরীয়ত "تَمَّتْ" তথা নিজের পূর্ণতায় উপনীত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, এতে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই আয়াতে কুরআন পাকের চারটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে: কুরআন পাক স্বয়ংসম্পূর্ণ, এতে বর্ণিত প্রতিটি কথা সত্য ও বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত, এর সকল বিধান ন্যায় ও সুবিচারের সমন্বয়ে গঠিত এবং এটি চিরকালের জন্য সর্বপ্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত। আল্লাহ পাকের কালাম যখন নিজের পূর্ণতায় উপনীত হয়েছে এবং এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সম্ভাবনাকে সরাসরি নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, তখন এর পর কোনো নতুন নবীর মাধ্যমে কোনো নতুন ওহী নাযিল হওয়ার সম্ভাবনা স্বয়ং এই পূর্ণতার ঘোষণার সাথেই সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়।

অনুরূপভাবে সূরা আনআমের ৩৪ নাম্বার আয়াতে রয়েছে:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۴﴾

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং আপনার পূর্বেও বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে। তখন তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছিলেন এ অস্বীকার করা ও কষ্ট পাওয়ার উপর, যে পর্যন্ত তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে; এবং আল্লাহর বাণীসমূহ পরিবর্তনকারী কেউ নেই এবং আপনার নিকট রাসূলগণের খবরাদি এসেই গেছে।

(পারা: ৭, সূরা: আনআম: ৩৪)

অধিকন্তু সূরা কাহাফে ইরশাদ করেন:

وَاتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۷﴾

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং পাঠ করুন যা আপনারই প্রতিপালকের কিতাব আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং কখনই আপনি তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না।

(পারা: ১৫, সূরা: কাহাফ: ২৭)

**ব্যাখ্যা:** এই আয়াতে নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি তাঁর প্রতি নাযিলকৃত ওহীর তিলাওয়াত অব্যাহত রাখেন; এবং সেই সাথে এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, এই ওহীর বাক্যসমূহকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। পরিবর্তন না হওয়ার এই নিশ্চয়তা বিশেষভাবে তাঁর প্রতি নাযিলকৃত ওহীর সাথে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা নিজেই এই কথার অকাট্য প্রমাণ যে, এই ওহী-ই চূড়ান্ত সমাধান এবং এর পর নতুন কোনো ওহীর মাধ্যমে এতে কোনো পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

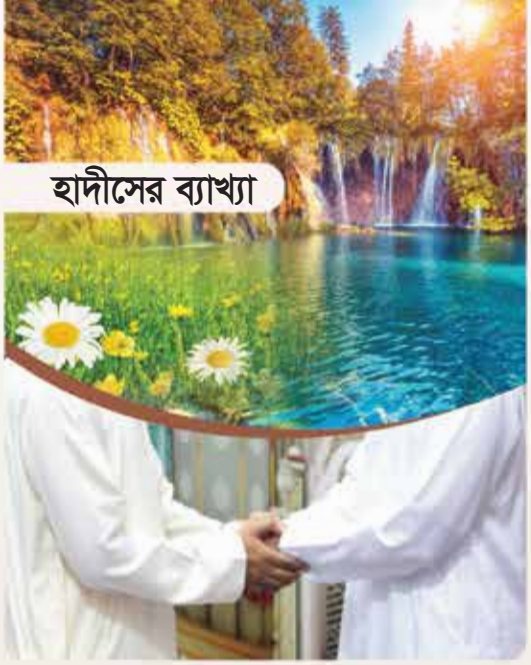
কালামে ইলাহী পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত থাকার মর্মার্থ সূরা ইউনুসেও বিদ্যমান রয়েছে:

لَا تَبْدِیْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۶۴﴾

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আল্লাহর বাণীসমূহ পরিবর্তিত হতে পারেনা। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য। (পারা: ১১, সূরা: ইউনুস: ৬৪)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই সমস্ত আয়াত কুরআনুল করীমের সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, কালামে ইলাহী পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন সম্ভব নয়। সুতরাং কালামে ইলাহী যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তো এখন কোনো নবীর আগমন স্বয়ং এই পূর্ণতার ঘোষণার পরিপন্থী হবে; আর আল্লাহ পাকের বাণী কখনো মিথ্যা হতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরেও কোনো নবী জন্মগ্রহণ বা আবির্ভূত হওয়ার দাবী করে অথবা এমন দাবীদারকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে, সে কাফের, মুরতাদ, মিথ্যাবাদী, প্রতারক এবং আল্লাহর কালামের অস্বীকারকারী।

**নোট:** যেসকল আয়াতে পাকে কুরআনুল করীমের সত্যতার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, সেগুলোও খতমে নবুওয়তের আক্বীদার অকাট্য দলিল; এর বিস্তারিত বিবরণ আগামী মাসের সংখ্যায় আসবে। اِنْ شَآءَ الله




# মুসলমানের সম্মান রক্ষার পুরস্কার

মাওলানা নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يَّرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করল, আল্লাহ পাকের দায়িত্ব যে, তিনি তাকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (মুসনাদে আহমদ, ৪৫/৫২৪, হাদীস: ২৭৫৩৬)

## সম্মান রক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য

মুসলমানের সম্মান রক্ষা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; তার গীবতকারী, তার প্রতি দোষারোপকারী এবং তাকে কষ্টদানকারীকে প্রতিহত করা বা তার পক্ষ থেকে আত্মরক্ষা/প্রতিরক্ষা করা; আর এই প্রতিরক্ষাই তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে। এর কারণ হলো, সম্মান রক্তের সমতুল্য; অতএব সম্মানহানি করা রক্ত প্রবাহিত করার মতো এবং সম্মান রক্ষা করা রক্ত রক্ষা করার মতো। (ফয়যুল কদীর, ৬/১৭৫; শরহুল মাসাবীহ লি-ইবনে মালেক, ৫/৩০৬; আল-মাফাতীহ, ৫/২২৬; দালীলুল ফা'লেহীন, ৪/৩৫৪)

সমাজের উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা অপরিহার্য এবং একে অপরের অধিকার রক্ষা করা ব্যতিরেকে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই কারণেই আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপরের অধিকার হরণের উপর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তা থেকে বারণ করেছেন, অধিকার সংরক্ষণের তাগিদ দিয়েছেন এবং তা আদায়কারীদের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস এটিও; আসুন! এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটি আরও বিশদভাবে উপলব্ধি করি:

## (১) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং এর দাবী:

এই হাদীসে "নিজের মুসলিম ভাই" শব্দ এসেছে, যা একজন মুসলমানের প্রতি সম্মানের অনুভূতি জাগ্রত করে। আর এই ভ্রাতৃত্বের হক্ব আদায়পূর্বক নিজের মুসলিম ভাইয়ের সম্মানের পক্ষে দাঁড়ানোর কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তিকে পুরস্কার ও সুসংবাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ফযিলত ও দাবিসমূহের উপর কয়েকটি হাদীস পাঠ করি:

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমান মুসলমানের ভাই; সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে অপদস্থ করবে না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের চাহিদা

পূরণে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ পাক তার চাহিদা পূরণ করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ থেকে কোনো এক বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী, ২/১২৬, হাদীস: ২৪৪২)

(২) হযরত নু'মান বিন বশীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকল মুসলমান একটি দেহের মতো; যখন তার চোখে কষ্ট হয়, তখন সমস্ত দেহে কষ্ট অনুভূত হয়, আর যদি মাথায় ব্যথা হয়, তবে সমস্ত দেহে ব্যথা অনুভূত হয়। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৭১, হাদীস: ৬৫৮৮)

(৩) হযরত আবু মূসা আশ'আরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য একটি প্রাচীর বা ইমারতের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করে।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৭১, হাদীস: ৬৫৮৫)

## (২) জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী আমল:

জিহ্বা যদিও ছোট একটি অঙ্গ, একে নাড়াচাড়া করতে সাধারণত কোনো কষ্ট বা পরিশ্রমের শিকার হতে হয় না; কিন্তু এর মাধ্যমে অবাধ্যতা হয় অনেক বড়। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় জিহ্বার প্রভাব অনেক বেশি। সাধারণত অধিকাংশ গুনাহও এর মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। ফেতনা-ফাসাদের অধিকাংশ ভিত্তিও জিহ্বার উপর। কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো এই জিহ্বা। যেভাবে জিহ্বা দিয়ে বহু গুনাহ সংঘটিত হয়, ঠিক তেমনি এর দ্বারা বহু নেক আমলও সম্পাদন করা যায়। সেই নেক আমলসমূহের মধ্যে একটি বিরাট নেক আমল হলো জিহ্বার মাধ্যমে নিজের মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করা। জিহ্বার এটি এমন এক আমল, যা আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

## মুসলমানের সম্মান কীভাবে রক্ষা করবেন?

জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ এক বিরাট পুরস্কার। পুরস্কার বড় হলে তা অর্জনের জন্য পরিশ্রম-প্রচেষ্টাও বেশি করতে হয়। অতএব আসুন! এ প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি নীতিমালা নির্ধারণ করে নিই, যা অবলম্বন করে আমরা মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করতে পারি:

## (১) মুসলিম ভাইয়ের মন্দ আলোচনা না শোনার অঙ্গীকার করুন:

আল্লাহ পাক আমাদের পাথরের মতো মজবুত এবং পাহাড়ের চেয়েও সুউচ্চ সংকল্পের নেয়ামত দান করেছেন। আমরা যদি কঠিন থেকে কঠিনতম কাজ করারও দৃঢ় সংকল্প করি এবং তাতে আল্লাহর রহমত সাথে থাকে, তবে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ সেই কাজ হয়ে যায়। নিজের মুসলিম ভাইয়ের মন্দ আলোচনা না শোনার যদি দৃঢ় সংকল্প থাকে, তবে এমন স্পর্শকাতর মুহূর্তে লজ্জা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, কারও প্রভাব-প্রতিপত্তি চেপে বসে না এবং কারও কটূবাক্যের ভয় বা নিন্দার আশঙ্কা সামনে আসতে পারে না। কোথাও যদি পরিস্থিতি অধিক জটিল হয়েও দাঁড়ায়, তবে

এই দৃঢ় সংকল্পই প্রজ্ঞাপূর্ণ বহু পথ প্রদর্শন করে। এমন প্রতিটি মুহূর্তে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই ঘটনাটি স্মরণে থাকা উচিত; অতএব একদা তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন: যখন তোমরা কোনো (কটূভাষী) ব্যক্তিকে নিজের ভাইয়ের সম্মানের ধুলো উড়িয়ে দিতে (সম্মানহানি করতে) দেখো, তখন তোমাদের কী হয়ে যায় যে, তাকে বারণ করো না? লোকজন আরয করল: আমরা তার মুখের বিষকে ভয় করি। তিনি বললেন: এর অধিক সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা (কেয়ামতের দিন) সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্তই থাকবে না। (জামেয়ে মুআম্মার বিন রাশিদ মাআ মুসান্নিফে আব্দুর রাযযাক, ১০/১৮৯, হাদীস: ২০৪২৯)

## (২) নীরব সমর্থনও কিছুতেই করবেন না:

কোনো মুসলমানের গীবত ইত্যাদি করা হলে এমন মুহূর্তে মুচকি হাসা কিংবা নীরব থাকাটাও এক ধরনের সমর্থনের রূপ, যা বক্তার এই কবিরা গুনাহে উৎসাহ জোগানোর মাধ্যম হয়। এমন সময়ে যদি সরাসরি বারণ করা সম্ভব না-ও হয়, তবে অসন্তুষ্টির অভিব্যক্তি প্রকাশ করাও মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করার এবং ভিত্তিহীন কটু কথা বলা ব্যক্তিকে প্রতিহত করার মাধ্যম হয়ে যায়।

## (৩) প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দিন:

কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে "অগোচরে সংশোধন"-এর চমৎকার শিরোনাম দিয়ে তার গীবত, দোষচর্চা বা অপবাদ ইত্যাদি জাতীয় মৌখিক গুনাহ করা হতে থাকলে, এমন গুনাহের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করার জন্য প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দেওয়া অত্যন্ত উপকারী সাব্যস্ত হয়। এমন পরিস্থিতিতে লোকজনকে এই নিকৃষ্ট বিষয় থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আল্লাহ ও মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিকির শুরু করা, বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী বা ঘটনাবলী শোনানো, লোকজনের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করা বা বলা এবং কোনো শিক্ষণীয় কাহিনী শুনিয়ে দেওয়া পরিবেশকে আনন্দমুখর করে তোলার মাধ্যম হয়।

## (৪) বোঝানো শিখে নিন:

কখন, কোথায়, কী এবং কীভাবে বলতে হবে, এই বিদ্যা জানা থাকলে জীবন প্রশান্তিময় হয়ে ওঠে এবং সমাজের পরিবেশ মনোরম হয়ে যায়। দাওয়াতে ইসলামী এ ক্ষেত্রে এক অনন্য শিক্ষালয়, যেখান থেকে অগণিত মানুষ বোঝানোর কৌশল শিখেছে এবং আজ তারা সারা বিশ্বের জন্য কল্যাণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই সবকিছু বলার উদ্দেশ্য হলো; আপনারাও যদি মুসলমানের সম্মান রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প করে থাকেন, তবে দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বোঝানোর কৌশলও শিখে নিন; এটি এমন এক যোগ্যতা যা আপনাকে দ্বীন ও দুনিয়ায় সফল ও সার্থক করে তোলার মাধ্যম প্রমাণিত হবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুসলমানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের প্রেরণা দান করুক এবং মুসলমানদের সম্মানের রক্ষক বানিয়ে দ্বীক ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ দান করুক।

সর্বশেষ নবীর প্রিয় মুজিযা

# আঙ্গুলসমূহ আলোকিত হয়ে গেল



মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

প্রিয় বাচ্চারা! আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযায় আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শনও ফুটে ওঠে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাঁর সুরক্ষার খোদায়ী ব্যবস্থাপনাও প্রকাশ পায় এবং রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিকমত ও রহমতের বিষয়টিও জানা যায়। আজ এমনই এক ঈমান উজ্জীবিত ঘটনা পড়ব, যাতে রাতের অন্ধকারে তাঁর বাহন থেকে পড়ে যাওয়া জিনিসপত্র সহজে খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযাপূর্ণ শানে সাহাবীয়ে রাসূলের আঙ্গুলসমূহ আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার বিবরণ হলো:

একবার হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে সফর করে সাহাবায়ে কিরামের সাথে মদীনা শরীফে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে শত্রু মুনাফিকরা এক চক্রান্ত করল যে, এই পথের কিছুটা অংশ উঁচুতে এবং বেশ সরু; সেখানে রাতের অন্ধকারে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে উটনীর উপর সওয়ার থাকবেন তাকে উত্যক্ত ও অস্থির করে দেওয়া হবে, যাতে হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যান (مَعَاذَ الله)। আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সেই মুনাফিকদের চক্রান্ত সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। তখন হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য সকল মানুষকে পাহাড়ের নিচ দিয়ে যাওয়া নিরাপদ, সহজ ও প্রশস্ত পথ দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির এবং হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে সাথে নিয়ে পাহাড়ের সংকীর্ণ পথ দিয়ে রওয়ানা হলেন।

শত্রুরা কিছুটা দূরে থেকে হুযুরে আকরামের পিছু নিতে লাগল। অতঃপর এক জায়গায় তারা হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঘিরে ফেলার অপচেষ্টা চালাল এবং তাঁর বাহন উটনীকেও উত্যক্ত করল, যাতে সে দ্রুত দৌঁড়ায় এবং শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে আরোহীকে ফেলে দেয়। এতে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহন থেকে কিছু জিনিসপত্র নিচে পড়ে গেল। হযরত হুযায়ফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মুনাফিকদের সেখান থেকে তাড়াতে

এবং তাদের সাওয়ারীর মুখের উপর আঘাত করতে লাগলেন। অপরদিকে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও উচ্চঃস্বরে তাদের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছিলেন; যার কারণে তারা বুঝে ফেলল যে, তাদের চক্রান্ত রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জেনে ফেলেছেন। ফলে তারা দ্রুত নিচের দিকে পালিয়ে গেল এবং সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গেল।

ইতিমধ্যে হযরত হামযা বিন আমর আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও সেখানে হুযুরে আকরামের সাথে এসে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন: আমি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহন থেকে পড়ে যাওয়া মালামাল কুড়াতে চাইলে আমার পাঁচটি আঙ্গুলই উজ্জ্বল হয়ে আলো ছড়াতে লাগল; যার আলোতে আমি চাবুক, রশি এবং পড়ে যাওয়া যাবতীয় জিনিসপত্র খুঁজে নিয়ে জড়ো করলাম।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৫/৪৬৬; সীরাতে হালাবিয়া, ৩/২০১)

প্রিয় বাচ্চারা! হযরত হামযা বিন আমর আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পাঁচটি আঙ্গুল আলোকিত হয়ে যাওয়া আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক মহান মুজিযা ছিল। এই ঘটনা থেকে আমরা বহু চমৎকার শিক্ষা লাভ করতে পারি:

✯ আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। মুনাফিকরা হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষতিসাধনের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাদের পরিকল্পনা জানিয়ে দিয়েছিলেন; আল্লাহর দানে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গায়েবের বিষয়াদি অবগত হতেন।

✯ কঠিন পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে না গিয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশলে সংকটের মুখোমুখি হওয়া উচিত।

✯ সতর্কতা অবলম্বন করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

✯ একজন আদর্শ নেতা কেবল নিজের নয়, বরং স্বীয় সঙ্গীদের সুরক্ষারও ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদের জন্য বিষয়াদী সহজ করে দেন।

✯ নিজ মুরুব্বিদের খেদমত করা এবং তাঁদের জিনিসপত্রের হেফাজত করা সৌভাগ্যবানদের কাজ।

✯ কারও পক্ষ থেকে আঘাত বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত এবং আত্মরক্ষার জন্য ভিড়ের আশ্রয় নেওয়া বা না নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া উচিত; কখনো ভিড় বিপদ থেকে বাঁচায়, আবার কখনো ভিড়ের মধ্যে বিপদ বেড়ে যায়।

✯ বিপদের সময় অপরের উপকারে আসা অনেক বড় নেকীর কাজ।

✯ আমাদের রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনি থেকে প্রজ্ঞা অর্জন করা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখা উচিত।

✯ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাহ্যত যতোই সাধারণ বা তুচ্ছ হোক না কেন, প্রয়োজনের মুহূর্তে তা অনেক কাজে আসে; অতএব সেগুলোর মূল্যায়ন ও হেফাজত করা উচিত এবং সেগুলো এদিক-ওদিক পড়ে থাকলে তা অবহেলা করা উচিত নয়।



# মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

## (১) পোশাকে তালি লাগানো

**প্রশ্ন:** পোশাকে তালি লাগানো কি সুন্নাত?

**উত্তর:** জ্বী হ্যাঁ, পোশাকে তালি লাগানো সুন্নাতে মুবারাকা। হাদীসে পাকে রয়েছে: পোশাককে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরনো মনে কোরো না যতক্ষণ না তাতে তালি লাগাও। (তিরমিযী, ৩/৩০২, হাদীস: ১৭৮৭) অধিকন্তু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকেও পোশাকে তালি লাগানো প্রমাণিত। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬/১০৮; তারীখে ইবনে আসাকির, ৫৯/১৭১) তালি লাগানো এমন কোনো সুন্নাত নয় যে, কেউ তালি না লাগালে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে। বর্তমানে তো পরিস্থিতি এতোটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, কেউ যদি তালি লাগায়, তবে হতে পারে মানুষ তাকে নিয়ে সমালোচনা করবে যে, "তার কাছে তো অনেক টাকা আছে, কিন্তু মানুষকে দেখানোর জন্যই তালি লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়!" অথবা এছাড়া আরও অনেক কথাই হয়তো বলা হতে পারে; অথচ মুসলমানদেরকে মন্দ ধারণা, কুধারণা এবং গুনাহ থেকে রক্ষা করাও আবশ্যক। কেউ যদি সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে পোশাকের ছেঁড়া স্থানে তালি লাগাতেই চায়, তবে খুব ভালো হয় যদি কাপড়ের এমন অংশে তালি লাগায় যেখানে কারও দৃষ্টি পড়বে না; যেমন পায়জামার ছেঁড়া এমন অংশে তালি লাগিয়ে নেওয়া যা জামার নিচে ঢাকা থাকে, ফলে তালি লাগানোও হয়ে যাবে এবং কোনো প্রকার লোকদেখানো ভাবও প্রকাশ পাবে না। (মাদানী মুযাকারা, ১৩ মুহাররামুল হারাম ১৪৪৩ হিজরী)

## (২) কুদৃষ্টির প্রভাব কতদিন থাকে?

**প্রশ্ন:** বদনজরের প্রভাব কতদিন পর্যন্ত থাকে?

**উত্তর:** কখনো কখনো এমন হয় যে, বদনজরের প্রভাব প্রকাশই পায় না; আবার কখনো প্রকাশ পেলেও তা দ্রুত চলে যায়, যেমন কারও থেকে দম করিয়ে নিলে বা নিজে নিজের উপর দম করে নিলে তৎক্ষণাৎ বদনজরের প্রভাব কেটে যায়। আবার কখনো এমন হয় যে, বদনজরের প্রভাব মানুষকে শয্যাশায়ী করে দেয়, এমনকি কখনো কখনো কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এভাবে বদনজরের প্রভাব শেষ হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

(মাদানী মুযাকারা, ১৩ মুহাররামুল হারাম ১৪৪৩ হিজরী)

## (৩) বাহারে শরীয়তের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালবাসা

**প্রশ্ন:** সর্বপ্রথম 'বাহারে শরীয়ত'-এর সাথে আপনার পরিচয় কখন হয়েছিল?

**উত্তরঃ** আমার তখন বাল্যকাল ছিল এবং ততো বেশি বোধজ্ঞান ছিল না। আমাদের এলাকার বাদামী মসজিদের (ওল্ড সিটি এরিয়া, করাচি) ইমাম সাহেব প্রতিদিন দু-একটি মাসআলা বর্ণনা করতেন, যা শুনতে আমার খুব ভালো লাগত। একবার যোহরের নামাযের পর এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন; তখন আমিও আমার বড় ভাইয়ের সাথে সেখানেই ইমাম সাহেবের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইমাম সাহেব কাউকে বললেনঃ "বাহারে শরীয়ত নিয়ে এসো।" তখন তিনি বাহারে শরীয়তের একটি খণ্ড নিয়ে এলেন, যার উপর একটি সুন্দর প্রচ্ছদ এবং রঙিন পৃষ্ঠা ছিল। ইমাম সাহেব কিতাবটি খুললেন, তাতে "মাসআলা, মাসআলা" লেখা ছিল। তা দেখে আমার জিভে জল চলে আসছিল! অথচ সে সময় আমার এতোটুকু ধারণাও ছিল না যে, এই কিতাব দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। সে সময় ইমাম সাহেব সেই ব্যক্তিকে মাসআলা বুঝিয়ে দিলেন এবং আমার কাছে সেই কিতাবটি খুব ভালো লাগল; কিন্তু আমি গরিব পরিবারের সন্তান ছিলাম, কিতাব কোথা থেকে কিনবো!! পরবর্তীতে আমার যখন আরও বোধশক্তি হলো, তখন আমি বাহারে শরীয়তের ১৭টি খণ্ড পাকিস্তানী ২৮ রুপিতে ক্রয় করি। এখন আমার মনে নেই যে, পুরো সেট একসাথে কিনেছিলাম নাকি কিছু কিছু খণ্ড করে কিনেছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি "বাহারে শরীয়ত" থেকে প্রচুর উপকার লাভ করেছি; এমনকি মানুষ এতো বাড়িয়ে বলেছে যে, "ইলইয়াস কাদেরী বাহারে শরীয়তের হাফেয!" অথচ বিষয়টি মোটেও এমন নয়। আমি আগেও বাহারে শরীয়তের হাফেয ছিলাম না, এখনও নই। তবে বাহারে শরীয়তের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা রয়েছে। আমি এই কিতাবের দরস প্রদান করতাম এবং এই দরসের ঘোষণা নিজে লিখে চার-পাঁচ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পত্রিকার অফিসে যেতাম এবং তাদের দিয়ে বলতাম এই ঘোষণাটি ছাপিয়ে দিন যে, অমুক স্থানে বাহারে শরীয়তের দরস অনুষ্ঠিত হবে।

(মাদানী মুযাকারা, ২ যিলক্বাদাতুল হারাম ১৪৪২ হিজরী)

## (৪) ভারতে বিহারের ওলামায়ে কিরামের বসন্ত

**প্রশ্নঃ** আপনি কি কখনো "বিহার" (ভারত)-এ তাশরীফ এনেছেন?

**উত্তরঃ** আমি এখনও পর্যন্ত "বিহার" (ভারত)-এ যেতে পারিনি। তবে এ কথা আমার জানা রয়েছে যে, "বিহার" সমগ্র ভারতকে ওলামা উপহার দিয়ে থাকে; যেমন পাকিস্তানে অধিকাংশ হাফেয ও ওলামা পাঞ্জাব থেকে হন, ঠিক তেমনি ভারতের বহু ওলামা বিহার থেকে হন। বিহারের মুসলমানেরা দ্বীনি ইলমকে ভালবাসেন; নিজেদের সন্তানদের ওলামা ও ইমাম বানান। মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মুফতী ওয়াক্বারুদ্দীন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সম্পর্ক "বিহার"-এর সাথে; মুফতী আব্দুল হালীম সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ও "বিহার"-এর সন্তান; খলীফায়ে আলা হযরত মুফতী জাফরুদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যিনি "সহীহুল বিহারী" এবং "হায়াতে আলা হযরত"

রচনা করেছেন এবং যাঁর ফতোয়া সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে, তিনিও বিহারী।

(মাদানী মুযাকারা, ৭ যিলহজ্জাতুল হারাম ১৪৪২ হিজরী)

## (৫) আহত ব্যক্তির দোয়া কি কবুল হয়?

**প্রশ্ন:** শোনা যায় যে, "কারও আঘাত লাগলে সে সময় দোয়া করা উচিত; কেননা সে সময় দোয়া কবুল হয়।" এই কথাটি কতটুকু সঠিক?

**উত্তর:** কুরআন পাকে রয়েছে:

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** না তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন তাঁকে আহ্বান করে এবং দূরীভূত করে দেন বিপদাপদ এবং তোমাদেরকে ভূ-খন্ডের মালিক করেন?

(পারা: ২০, সূরা: নামল: ৬২)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক অসহায়, নিরুপায়, ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন। কোনো এক কবি আঘাত পাওয়ার বিষয়ে কতই না চমৎকার বলেছেন:

**মরনে কি তরফ দেখ না জীনে কি তরফ দেখ**
**জব চোট লাগে দিল পে মদীনে কি তরফ দেখ**

(মাদানী মুযাকারা, ২৫ সফরুল মুযাফফর ১৪৪৩ হিজরী)

## (৬) নওচান্দি জুমার রাতের বাস্তবতা

**প্রশ্ন:** নওচান্দি জুমার রাতের (চাঁদের প্রথম বৃহস্পতিবারের) বাস্তবতা কী?

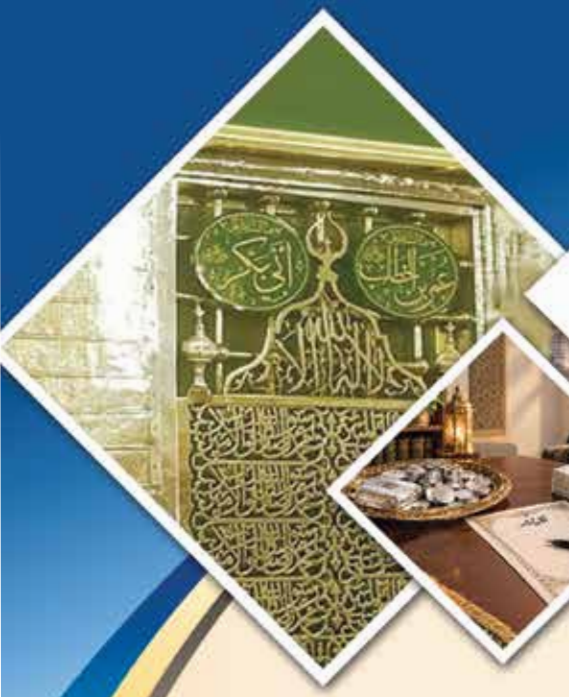
**উত্তর:** চন্দ্র মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারকে নওচান্দি জুমার রাত বলা হয়। বুযুর্গদের নিকট থেকে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন আওরাদ বর্ণিত রয়েছে যে, প্রথম বৃহস্পতিবারে এটি পড়তে হবে আর দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে এটি পড়তে হবে, তাতে কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে কিছু মানুষ প্রথম বৃহস্পতিবারে আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার শরীফে হাজিরা দিয়ে থাকেন, এতেও কোনো দোষ নেই; তবে শর্ত হলো এই আমলগুলোকে আবশ্যকীয় মনে করা যাবে না।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ যিলক্বাদাতুল হারাম ১৪৪২ হিজরী)

## (৭) বাড়ি বিক্রির সময় ফ্যান খুলে নেওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** কেউ যদি বাড়ি বিক্রি করে, তবে যে ফ্যান ইত্যাদি থাকে তাও কি সেই ব্যক্তির মালিকানা যার কাছে বাড়ি বিক্রি করা হয়েছে?

**উত্তর:** ফ্যান খুলে নিয়ে যাওয়ারই প্রচলন রয়েছে; অর্থাৎ যে বাড়ি বিক্রি করে সে ফ্যান খুলে নিয়ে যায়। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় ফ্যান রেখে দেয় বা বাড়ির সাথেই দিয়ে দেয়, তবে তাও ঠিক আছে। (মাদানী মুযাকারা, ৪ জুমাদিউল উলা ১৪৪২ হিজরী)





# দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতী মুহাম্মদ হাশিম খাঁন আত্তারী মাদানী

## (১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কি কেবল জাহেরী খেলাফতে প্রথম নাম্বারে রয়েছেন?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, এমন আক্বীদা পোষণকারী ব্যক্তির হুকুম কী, যে মনে করে জাহেরী খেলাফতে হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং বাতেনী খেলাফতে হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রথম নাম্বারে রয়েছেন?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

সকল আহলে সুন্নাত মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে যে, যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক্ব জাহেরী খেলাফতে খলীফায়ে বিলা ফাসল (ব্যবধানহীন খলীফা) এবং সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ঠিক তেমনি বাতেনী খেলাফতে (বেলায়েত ও আধ্যাত্মিকতায়)-ও কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ও বিশিষ্টকরণ ছাড়াই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খলীফায়ে বিলা ফাসল এবং সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ।

জাহেরী ও বাতেনী খেলাফতের উল্লেখিত বিভাজন বিদআতী লোকদের মাযহাব। চার খলীফা ক্রমানুসারে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ও বাতেনী উভয় খেলাফতেরই সমন্বায়ক ছিলেন এবং তাঁরা উভয় খেলাফতই (জাহেরী ও বাতেনী) লাভ করেছিলেন। অতএব যে ব্যক্তি বলে যে, জাহেরী খেলাফতে হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং বাতেনী খেলাফতে হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রথম নাম্বারে আছেন, তার এই বক্তব্য সত্যের পরিপন্থী এবং এমন ব্যক্তি আহলে সুন্নাত থেকে বহিষ্কৃত, পথভ্রষ্ট ও বেদ্বীন। তার উপর আবশ্যক হলো; সে এ থেকে তাওবা করে পুনরায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সত্য মাযহাব গ্রহণ করবে।

### একটি সংশয় নিরসন:

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করা জরুরী, আর তা হলো, সকল আহলে সুন্নাতের এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, বেলায়েত, আধ্যাত্মিকতা এবং রব্বানী নৈকট্যের যে মর্যাদা জনাবে সিদ্দীক্বে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ লাভ করেছেন, সেই মর্যাদা আম্বিয়া ও মুরসালীন عَلَیْہِمُ السَّلَام এর পর অন্য কোনো মানুষের অর্জিত হয়নি। আর এই রব্বানী নৈকট্য ও আত্মিক মারেফাতের কারণেই জনাবে সিদ্দীক্বে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সমগ্র উম্মতের উপর নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন।

অবশ্য জনাবে মাওলাল মুসলিমীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর এখানে একটি আংশিক ফযিলত রয়েছে, যা অন্য কোনো সাহাবীর নেই; আর তা হলো; বেলায়েতের যে ফয়যান ও হেদায়েত সৃষ্টির মাঝে পৌঁছেছে এবং যে ফয়যান পৌঁছাবে, সেই হেদায়েত ও ফয়যানের মূল রাহবার ও কাণ্ডারী হলেন মাওলা মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ; এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বেলায়তের ফয়যান বণ্টনের দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পিত। এটি তাঁরই এক বিশেষ গুণ এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর আংশিক ফযিলত, যা হযরত সিদ্দীক্বে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধী নয়।

এর মাধ্যমে অধিকাংশ বাতিলপন্থীরা সহজ-সরল সুন্নীদের ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা করে থাকে যে, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বাতেনী খেলাফত ও ইলাহী নৈকট্যে জনাবে সিদ্দীক্বে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং জনাব আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তো কেবল রাজনৈতিক খলীফা ছিলেন! হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর তাকমীল ও ইরশাদের এই স্তরের বিশেষত্বকে টেনে নিয়ে শায়খাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা এটি হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর একটি আংশিক ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য মাত্র, যা শায়খাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বিক মর্যাদার সামান্যতমও পরিপন্থী নয়। আর কেবল এই একটি বৈশিষ্ট্যই কেন, জনাব আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর এমন বহু বিশেষ ফযিলত ও উৎকর্ষ রয়েছে, যা অন্য কোনো সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেলায়ত, আধ্যাত্মিকতা ও খোদায়ী নৈকট্য যা জনাবে সিদ্দীক্বে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ লাভ করেছেন, তা মাওলা মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বরং সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের চেয়েও অধিক; আর এটিই হলো নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের মূল মাপকাঠি।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## (২) ইহরামের অবস্থায় গোঁফ ছাঁটা কেমন?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, যদি কোনো মুহরিম ইহরামের অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো অপারগতা ছাড়া নিজের অর্ধেক বা সম্পূর্ণ গোঁফ কেটে বা ছেঁটে ফেলে, তবে কী হুকুম হবে?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ইহরামের অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো অপারগতা ছাড়া নিজের গোঁফ ছাঁটা বা কাটা নাজায়িয ও গুনাহ; অধিকন্তু এর দ্বারা একটি "সদকা"-ও ওয়াজিব হয়। অতএব কোনো মুহরিম যদি ইহরামের অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওজর ছাড়াই অর্ধেক কিংবা সম্পূর্ণ গোঁফ কেটে ফেলে, তবে তার উপর এই গুনাহ থেকে তাওবা করার পাশাপাশি একটি "সদকা" আদায় করাও আবশ্যক হবে।

**নোট:** সদকার পরিমাণ হলো একটি সদকায়ে ফিতরের সমপরিমাণ; অর্থাৎ অর্ধ সা' (এক কেজি নয়শত বিশ গ্রাম) গম বা তার আটা বা ছাতু, অথবা এক সা' (তিন কেজি আটশত চল্লিশ গ্রাম) খেজুর, কিসমিস বা যব কিংবা তার আটা বা ছাতু, অথবা এগুলোর যেকোনো একটির মূল্য কোনো শরয়ী ফকির অর্থাৎ যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া। চাই তা হারাম শরীফে প্রদান করুক অথবা নিজ দেশে ফিরে এসে এখানকার কোনো দরিদ্রকে দিক। তবে উত্তম হলো; তা হারামের ফকিরদেরকেই দেওয়া। আর সদকা যেখানেই দেওয়া হোক না কেন, মূল্য সেই স্থানের দর অনুযায়ী প্রদান করতে হবে যেখানে সদকা আদায়কারী ব্যক্তি আদায়ের সময় নিজে উপস্থিত রয়েছে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## (৩) মোহরানায় রূপা নির্ধারণ হওয়ার পর পরবর্তীতে তার পরিবর্তে নগদ অর্থ দ্বারা মোহরানা আদায় করা কেমন?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমার বিয়ের সময় একশত বত্রিশ (১৩২) তোলা রূপা মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছিল; এখন আমি রূপার পরিবর্তে নগদ টাকা পরিশোধ করতে চাই, এটি কি জায়িয?

যদি জায়িয হয়, তবে বিবাহের সময় রূপার যে মূল্য ছিল সেই হিসাবে টাকা পরিশোধ করতে হবে নাকি বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনি যদি রূপার পরিবর্তে নগদ টাকায় মোহরানা আদায় করতে চান, তবে স্ত্রীর সন্তুষ্টি বা সম্মতিক্রমে যে অঙ্কের টাকার উপর উভয় পক্ষ একমত হবে, সেই অর্থ পরিশোধ করতে পারেন। কেননা মোহরানায় যে বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল পরবর্তীতে তার বিনিময়ে ভিন্ন জাতীয় কোনো বস্তু প্রদান করা অবস্থার দিক থেকে আপস-মীমাংসা এবং অর্থের দিক থেকে বেচাকেনা; আর বেচাকেনায় উভয় পক্ষের পারস্পরিক সন্তুষ্টি বা সম্মতি অপরিহার্য।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم




# ব্যবসার আহকাম

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

## কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবের পোস্ট তৈরি করা কেমন?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি গ্রাফিক্স ডিজাইনিং (Graphic Designing) এর কাজ করি; যার মধ্যে ছবির এডিটিং (Editing) এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল পোস্ট তৈরি করি। কখনো কখনো গ্রাহকেরা কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবের শুভেচ্ছা সম্বলিত পোস্ট তৈরি করতে বলে। জানার বিষয় হলো, কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবের শুভেচ্ছা সম্বলিত পোস্ট তৈরি করা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

**উত্তর:** কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবের শুভেচ্ছা জানানো না-জায়িয ও হারাম; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুফরী। অতএব আপনার জন্য কাফেরদের ধর্মীয় উৎসবের শুভেচ্ছা সম্বলিত পোস্ট তৈরি করে দেওয়া অন্তত পক্ষে অবশ্যই হারাম; কেননা এটি "تَعَاوُن عَلَى الْاِثْم" অর্থাৎ গুনাহের কাজে সহায়তা প্রদান করা, যা নাজায়িয ও গুনাহ এবং আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে এ থেকে নিষেধ করেছেন।

দুনিয়াবী লাভের জন্য কাফেরদের কুফরী রীতিনীতিতে সহায়তা করা নাজায়িয ও গুনাহ। যেমনটি আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "কুফরী রীতিনীতিতে সহায়তা করা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা নিষেধ, নাজায়িয, গুনাহ এবং খোদায়ী হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ।

قَالَ اللهُ تَعَالٰى: وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

**অনুবাদ:** আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আর তোমরা গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সাহায্য কোরো না।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: "مَنْ سَوَّدَ مَعَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَفِي لَفْظٍ مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের দলে শরিক হয়ে তাদের দল ভারী করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর এই বিষয়গুলো যদি নফসের অনিষ্ট এবং দুনিয়ার লোভে হয়, তবে তা কেবল জাহান্নামের

উপযুক্ততা তৈরি করে; আর যদি কোনো কুফরী রীতির প্রতি পছন্দ ও সন্তুষ্টির সাথে হয়, তবে তা প্রকাশ্য কুফর।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ২১, পৃষ্ঠা: ১৮৬)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## আফিমের ব্যবসা করা কেমন?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আফিমের ব্যবসা করা কেমন? এটি তো বহুবিধ ওষুধেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

**উত্তর:** আফিমের ব্যবসার বিধান হলো: ক্রেতার ব্যাপারে যদি জানা থাকে যে, সে এটি নেশার জন্য বা অন্য কোনো নাজায়িয কাজে ব্যবহারের জন্য নিচ্ছে, তবে এমন ব্যক্তির নিকট আফিম বিক্রি করা জায়িয নয়; কেননা এটি গুনাহের কাজে সহায়তা। আর যদি গ্রাহকের উদ্দেশ্য জানা না থাকে অথবা এ কথা জানা থাকে যে, সে এটি জায়িয চিকিৎসা প্রয়োজনে ব্যবহার করবে, যেমন: বাহ্যিক ব্যবহারের ওষুধ বা মলম তৈরি করবে, অথবা সেব্য ওষুধে এতোটা স্বল্প পরিমাণ মেশাবে যাতে নেশা না হয় এবং জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ের উপর কোনো প্রভাব না ফেলে, তবে এর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ নয়; বরং জায়িয। তবে আফিমের এই জায়িয ব্যবসা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

**নোট:** দেশীয় আইন অনুযায়ী আফিমের চাষ ও ব্যবসা নিষিদ্ধ; তবে কেবল চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক বা শিল্পকারখানার প্রয়োজনে আইনের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী এর সীমিত অনুমতি রয়েছে। অতএব যে অবস্থাটিকে জায়িয লেখা হয়েছে, তাতে আইনি শর্তাবলী ও বিধিনিষেধ পূরণ করাও আবশ্যক।

আফিমের ব্যবসা প্রসঙ্গে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন: "اِنَّ بَيْعَ الْاَفْيُوْنِ وَالْبَنْجِ وَاَمْثَالِهِمَا اَيْضًا مَكْرُوْهٌ اِلَّا مِمَّنْ عَلِمَ اَنَّهٗ لَا يَشْتَرِيْهَا لِلْمَعْصِيَةِ" অর্থাৎ আফিম ও ভাং এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ; তবে এমন ব্যক্তির নিকট ক্রয়-বিক্রয় করা ব্যতিক্রম যার ব্যাপারে জানা রয়েছে যে, সে গুনাহের উদ্দেশ্যে এটি ক্রয় করছে না।

(জাদ্দুল মুমতার, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৭৮)

সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আফিম খাওয়া না-জায়িয; তবে যখন কোনো ওষুধে এতোটা স্বল্প পরিমাণ মেশানো হয় যে, সেই ওষুধ খেলে ইন্দ্রিয়শক্তির উপর প্রভাব না পড়ে, তবে তা জায়িয। এর ক্রয়-বিক্রয় জায়িয; তবে এমন ব্যক্তির নিকট এটি বিক্রি করা যে, তা নাজায়িযভাবে সেবন করবে, তবে তা নিষিদ্ধ, কেননা এটি গুনাহের কাজে সহায়তা।"

(ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৮২)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## চুক্তিতে কাজ নিয়ে পরবর্তীতে অন্য কাউকে সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া কেমন?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি একজন ঠিকাদার এবং আমার কাছে শ্রমিকদের একটি পূর্ণাঙ্গ টিম

রয়েছে, যারা আমার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্মাণকাজ পরিচালনা করে। কখনো কখনো এমন হয় যে, আমি কোথাও থেকে কাজের প্রস্তাব পাই এবং গ্রাহক সেই কাজের বেশ ভালো পারিশ্রমিক বা পেমেন্টও দিয়ে থাকে; কিন্তু আমি আমার বর্তমান দলের সাথে অন্য কোথাও ব্যস্ত থাকার কারণে এই নতুন কাজটি সম্পন্ন করতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি নিজে গ্রাহকের সাথে বেশি মজুরি নির্ধারণ করে নিই এবং পরবর্তীতে সেই একই কাজ অন্য কোনো ঠিকাদারকে দিয়ে কম মজুরিতে করিয়ে নিই। এভাবে গ্রাহকের সাথে নির্ধারিত মজুরি এবং দ্বিতীয় ঠিকাদারকে দেওয়া মজুরির মধ্যকার যে পার্থক্য থাকে, তা আমি নিজের কাছে রেখে দিই। প্রশ্ন হলো, এমনটি করা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

**উত্তর:** জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যদি কন্ট্রাক্ট দেওয়ার সময় গ্রাহকের পক্ষ থেকে এই শর্তারোপ না করা হয়ে থাকে যে, এই কাজ আপনি নিজে স্বহস্তে সম্পাদন করবেন; বরং চুক্তি কেবল কাজ সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত মান অনুযায়ী কাজ করার হয়ে থাকে, তবে এমন ক্ষেত্রে আপনার জন্য এটি জায়িয যে, আপনি এই কাজ অন্য কোনো ঠিকাদারকে দিয়ে নির্ধারিত মান অনুযায়ী কম পারিশ্রমিকে করিয়ে নিতে পারেন। অধিকন্তু এই অবস্থায় গ্রাহকের সাথে নির্ধারিত পারিশ্রমিক এবং ঠিকাদারকে দেওয়া পারিশ্রমিকের মধ্যবর্তী যে অর্থ অবশিষ্ট থাকবে, তা আপনার জন্য হালাল হবে। কিন্তু যদি গ্রাহকের পক্ষ থেকে এমন শর্ত থাকে যে, কাজ আপনাকেই করতে হবে, তবে অন্য কোনো ঠিকাদারকে দিয়ে সেই কাজ করানো জায়িয নয়; বরং আপনার উপরই সেই কাজ সম্পন্ন করা আবশ্যক।

মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "বাহারে শরীয়ত"-এ বলেন: "যাকে দিয়ে কাজ করাতে হবে, তার সাথে যদি এই শর্ত করে নেওয়া হয় যে, তোমাকেই নিজে করতে হবে, কিংবা বলে দেওয়া হয় যে, তুমি নিজ হাতে করবে, এমন ক্ষেত্রে স্বয়ং তাকেই কাজ করা জরুরী। নিজের শাগরেদ বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ করানো জায়িয নয়। আর যদি এই শর্ত না থাকে যে, সে নিজে স্বহস্তে কাজ করবে, তবে সে অন্যকে দিয়েও করাতে পারে, চাই নিজের শাগরেদকে দিয়ে করাক, কর্মচারীকে দিয়ে করাক কিংবা অন্য কাউকে মজুরি দিয়ে করাক, সকল অবস্থায় জায়িয।"

**(বাহারের শরীয়ত, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১১৯)**

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



# হযরত সায়্যিদুনা যুবায়ের বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

একজন বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একবার আমি কিছু লোকের সাথে সময় কাটালাম। তখন তারা হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল। আমার মুখ থেকেও হযরত যুবায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিরুদ্ধে কিছু অনুচিত কথা বের হয়ে গেল। রাতে যখন আমি ঘুমালাম, তখন স্বপ্নে কী দেখতে পাই, আমি একটি সুবিশাল মরুভূমিতে রয়েছি; সেখানে অনেক মানুষ উপস্থিত ছিল। তাদের শরীর ছিল মানুষের মতো, কিন্তু মাথা ছিল কুকুরের মতো। প্রতিটি ব্যক্তির একপাশের হাত এবং অপর পাশের পা কাটা ছিল। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিল যার হাত ও পা, চারটিই কাটা ছিল! এর চেয়ে ভয়ংকর দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। আমার উপর ভয় ও আতঙ্ক চেপে বসল। পরিশেষে আমি সাহস সঞ্চয় করে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম: এরা কারা? তখন বলা হলো: এরা সেই সকল লোক যারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর শানে বেয়াদবী করে এবং এই পবিত্র ব্যক্তিত্বদের গালিগালাজ করে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম: হাত ও পা, চারটিই কাটা ব্যক্তির বিষয়টি কী? জানানো হলো: হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে কটূক্তি ও বাজে কথা বলার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিল।

অতঃপর দূরে একটি দরজা আমার দৃষ্টিগোচর হলো এবং আমি সেই দরজায় প্রবেশ করলাম। ভেতরে একটি উঁচু স্থান দেখতে পেলাম; আমি তার উপর উঠলাম, সেখানে এক নূরানী মজলিস সুসজ্জিত ছিল। মধ্যভাগে প্রিয় আক্বা মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ রেখেছিলেন। আমি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্নিকটে এলাম এবং তাঁর পবিত্র বরকতময় হাত মুবারক নিজ হাতে তুলে নিতে চাইলাম। তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের নূরানী হাত বাড়িয়ে

শক্তভাবে আমার হাত চেপে ধরলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি যুবায়েরের ব্যাপারে যা বলেছিলে, তা কি পুনরায় বলবে? সেই বুযুর্গ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এমন কথা আর কখনো দ্বিতীয়বার বলব না। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পেছনে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন: হে যুবায়ের! এ বলছে যে, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন করবে না; তুমি একে কিছু উপদেশ দাও। হযরত যুবায়ের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো উপদেশ দিয়েই দিয়েছেন। সেই বুযুর্গ বলেন: এরপর আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাত মুবারক নিজ হাতে নিলাম, তাতে চুম্বন করলাম এবং কাঁদতে লাগলাম; অতঃপর নূরানী হাত মুবারক নিজের বুকের সাথে স্পর্শ করালাম। এরপর আমার চোখ খুলে গেল, তখন আমি নূরানী হাতের স্নিগ্ধ শীতলতা নিজের পিঠের উপর অনুভব করছিলাম। (তারীখে ইবনে আসাকির, ১৮/৪৩৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অগণিত গুণ ও সম্মানের অধিকারী, আশারায়ে মুবাশশারাভুক্ত সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা যুবায়ের বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত প্রিয় এবং আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন।

## গভীর ভালবাসার এক অনন্য রূপ:

একবার মক্কায় রাতের বেলা আকাশে-বাতাসে এক আওয়াজ ধ্বনিত হলো: মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। এ কথা শোনামাত্র হযরত যুবায়ের তৎক্ষণাৎ তলোয়ার হাতে ঘর থেকে ছুটে বের হলেন। পথিমধ্যে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারণ জিজ্ঞেস করলেন: কী হয়েছে? হযরত যুবায়ের আরয করলেন: আমি শুনেছিলাম যে, আপনাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন: এমতাবস্থায় তোমার কী করার সংকল্প ছিল? আরয করলেন: আল্লাহর শপথ! আমার সংকল্প ছিল কারও পরোয়া না করে সমস্ত মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এক বর্ণনায় রয়েছে তিনি এভাবে আরয করলেন: আমার সংকল্প ছিল যাকে নাগালের মধ্যে পাব তার গর্দান উড়িয়ে দেব! এ কথা শুনে প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, নিজের চাদর মুবারক দান করলেন এবং দোয়ায় ধন্য করলেন। (আল মুসতাত্বরাফ, ১/২৪২)

## পবিত্র অবয়ব:

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চোখ দুটি ছিল নীল, দুই কাঁধ সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া, গায়ের রঙ ছিল গমবর্ণের (এবং এক বর্ণনায় ফর্সা) আর দৈহিক উচ্চতা ছিল দীর্ঘ। (তারীখুল ইসলাম লিয যাহবী, ৩/৪৯৮) মাথার চুল ছিল মজবুত, বড় ও ঘন; তবে গালের দাঁড়ি মুবারক ততোটা ঘন ছিল না। বিস্ময়কর বিষয় এই ছিল যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর চুল মোটেও সাদা হয়নি। (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ৩/৭৯)

## ইসলাম গ্রহণ এবং চাচার নির্যাতন:

এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আঠারো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে ঈমানের নূরানী আভায় উদ্ভাসিত হন। তখন তাঁর চাচা এটি সহ্য করতে পারল না এবং ক্রোধে অন্ধ হয়ে সংকল্প করল যে, তাঁকে এই নতুন দ্বীন থেকে ফিরিয়ে পুনরায় তাদের পৈতৃক ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। সে তাঁকে একটি চাটাইয়ের ভেতর মুড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল এবং নিচ থেকে ধোঁয়া দিতে লাগল যাতে তিনি দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করেন। চাচা তাঁকে আল্লাহ পাকের মনোনীত দ্বীনে মতীন থেকে বিচ্যুত করতে এবং কুফরের অন্ধকার উপত্যকায় নিক্ষেপ করতে ক্রমাগত নির্যাতন চালাতে থাকল; কিন্তু নবুওয়াতের প্রদীপে আত্মোৎসর্গকারী এই অকুতোভয়ের সাহস ও অবিচলতার প্রতি কুরবান হয়ে যাই! সেই বেদনাদায়ক ও সংকটপূর্ণ অবস্থায়ও তিনি প্রতিবার এই উত্তরই দিলেন: لَا اَكْفُرُ اَبَدًا (অর্থাৎ আমি কখনো কুফর অবলম্বন করব না)।

(মু'জামুল কাবীর, ১/১২২, হাদীস: ২৩৯)

## মর্যাদা ও ফযিলত:

তাঁর পবিত্র সত্ত্বা এতো সুউচ্চ ছিল যে, বক্ষে বহু সম্মান ধারণ করে রেখেছিল। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি এবং আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম। (তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১/১৯২) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আল্লাহর রাস্তায় দুইবার হিজরত করেছেন, দুই ক্বিবলার দিকে ফিরে নামায আদায়ের সৌভাগ্য লাভ করেছেন; তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ব্যতীত আর কোনো সাহাবী নিজের মায়ের সাথে হিজরত করেননি। (আল ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত, ১৪/১২২) সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুরক্ষা ও সমর্থনে তলোয়ার উত্তোলনের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন তাঁরই পবিত্র সত্ত্বা।

(ম'জামুল কাবীর, ১/১১৭, হাদীস: ২২৬)

## রণক্ষেত্রের পরাক্রম:

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শনে এবং সর্বাগ্রে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। (শাযারাতুয যাহাব, ১/৭৪) গাযওয়ায়ে বদর ও ওহুদের যুদ্ধ থেকে শুরু করে সুলহে হুদাইবিয়া, মক্কা বিজয় এবং হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত এমন কোন ক্ষেত্র ও রণাঙ্গন ছিল না, যেখানে তিনি প্রিয় আক্বার সাথে উপস্থিত ছিলেন না! (তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১/১৯২) ২ হিজরীর মাহে রমযানে বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের কাছে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল; আর তার একটি ঘোড়ার উপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরোহী ছিলেন। (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ৩/৭৬) ৮ হিজরীর রমযানুল মুবারকে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ইসলামী সৈন্যবাহিনীর বাম অংশের সেনাপতি নিযুক্ত ছিলেন। (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ৩/৭৭)

## দ্বিতীয় খলীফার আস্থা:

ফারুকে আযমের সম্মানজনক দরবারেও তাঁর মর্যাদা অত্যন্ত সুউচ্চ ছিল। ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর সম্পর্কে এই বাক্য বলেছেন: আমি যদি কারও নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিতাম, তবে অবশ্যই যুবায়েরের নিকট থেকে নিতাম; তিনি

ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্য থেকে একটি মজবুত স্তম্ভ। (তারীখে ইবনে আসাকির, ১৮/৩৯৬)

## তৃতীয় খলীফার দৃষ্টিতে:

উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দরবারেও তাঁর মহত্ত্ব ও আভিজাত্যের সুবাস ছড়াচ্ছিল। হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যতোদূর আমার জানা রয়েছে, হযরত যুবায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

(সহীহ বুখারী, ২/৫৩৯, হাদীস: ৩৭১৭)

## চতুর্থ খলীফার দৃষ্টিতে:

হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দৃষ্টিতেও তাঁর মর্যাদা আকাশচুম্বী ছিল। যখন হযরত যুবায়ের শহীদ হলেন, তখন শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কন্যা হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কাঁদতে লাগলেন। কেউ একজন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: ইনি কাঁদছেন? তখন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: হযরত যুবায়েরের জন্য যদি না কাঁদে, তবে তাঁর পরে এমন কে আছে যার জন্য কাঁদা যেতে পারে! (তারীখে ইবনে আসাকির, ১৮/৪২৩)

## আমানতদার ও বিশ্বস্ত:

তাঁর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার উপর সাহাবায়ে কিরামের এতোখানি সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাতজন জলীলুল ক্বদর সাহাবী عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নিজেদের ওফাতের পর নিজেদের ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক হিসেবে তাঁকে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং হযরত যুবায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তাঁদের সম্পদের হেফাযত করতেন এবং তাঁদের সন্তানদের ভরণপোষণে নিজের উপার্জন থেকে ব্যয় করতেন। (তারীখে ইবনে আসাকির, ১৮/৩৯৭)

## জীবিকার মাধ্যম:

তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী হিসেবে স্বীয় মর্যাদা গড়ে তোলেন এবং কারও সামনে হাত প্রসারিত করেননি। (আল আ'লাম লিয যুরকালী, ৩/৪৩) এক অভিমত অনুসারে তিনি কসাই ছিলেন অর্থাৎ মাংসের ব্যবসা করতেন। (সীরাতে হালাবিয়া, ১/৩৯৬) ফারুক্বী যুগে মদীনা মুনাওয়ারার বক্বীর বাজারে কেবল একটিই কসাইখানা ছিল, যেখান থেকে মানুষ মাংস ক্রয় করত; আর সেই কসাইখানাটি তাঁরই মালিকানাধীন ছিল।

(মানাক্বিবু আমীরিল মুমিনীন, পৃষ্ঠা: ৬০)

## সফল ব্যবসায়ী হওয়ার রহস্য:

একবার তাঁর নিকট ব্যবসায় সাফল্যের রহস্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন: আমি কখনো ত্রুটিযুক্ত জিনিস ক্রয় করিনি এবং স্বল্প লাভকে কখনো প্রত্যাখ্যান করিনি; আর এমনিতেও আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা বরকতে ধন্য করে দেন।

(আর রিয়াদুন নাদরা, ৪র্থ অংশ, ২/২৮৬)

## আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়:

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অর্জিত যাবতীয় আয় অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতেন। তাঁর এক হাজার গোলাম ছিল, যারা প্রজাদের নিকট থেকে জমিনাদির খাজনা ও আয় উসূল করে তাঁর নিকট পৌঁছে দিত; (যখন সেই আয় আসত) তিনি

সারারাত তা বণ্টন করতে করতে অতিবাহিত করতেন; এরপর ঘরে ফেরার সময় সেই আয়ের একটি পয়সাও তাঁর কাছে অবশিষ্ট থাকত না। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/১৩৩) একবার তিনি নিজের একটি বাড়ি ৬ লাখে বিক্রি করলেন; তখন তাঁর সমীপে আরয করা হলো: হুযুর! আপনি তো (এই কেনাবেচায়) ঠকে গেছেন! তিনি বললেন: কখনোই নয়, আল্লাহর কসম! তোমরা জেনে রাখবে যে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইনি; কারণ আমি এই অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছি।

(উমদাতুল ক্বারী, ১০/৪৬৪, ৩১২৯নং হাদীসের পাদটীকা)

## সন্তান-সন্ততি:

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিবাহ করেন। তাঁর ১১ জন পুত্র এবং ৯ জন কন্যা সন্তান ছিল। (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ৩/৭৪; আর-রিয়াদুন নাদরা, ৪র্থ অংশ, ২/২৯১) শাহাদাতের মর্যাদার প্রতি তাঁর এতো গভীর ভালোবাসা ছিল যে, তিনি নিজের সকল পুত্রের নাম শহীদদের নামে রেখেছিলেন এবং আশা পোষণ করেছিলেন যেন তাঁর সন্তানেরাও এই চিরন্তন ও শাশ্বত সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে।

(ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ৩/৭৪)

## শাহাদাত লাভ:

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যখন বৃহস্পতিবার ১০ বা ১১ জমাদিউল উখরা ৩৬ হিজরীতে জঙ্গে জামালের ময়দান ত্যাগ করে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন আমর বিন জারমূয তাঁর পিছু নিয়ে প্রতারণাপূর্বক তাঁকে শহীদ করে দেয়। (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ৩/৮২) শাহাদাতকালে তাঁর বয়স মুবারক ছিল ৬৪ বছর। (তারীখে ইবনে আসাকির, ১৮/৪৩৩) ইরাকের জমিনে যে শহরে তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত, সেই শহরের নামই হলো 'মাদীনাতুয যুবায়ের'।



# আপন বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন

মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

জমাদিউল উখরা হলো ইসলামী বর্ষপঞ্জির ষষ্ঠ মাস। এতে যেসকল সাহাবায়ে কিরাম, ওলামায়ে ইসলাম এবং আউলিয়ায়ে এযামের ওফাত হয়েছে, তাঁদের মধ্য থেকে ১৩৪ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাসিক ফয়যানে মদীনার জমাদিউল উখরা ১৪৩৮ হিজরী থেকে ১৪৪৭ হিজরীর সংখ্যাসমূহে ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে; আরও ১৩ জনের পরিচিতি লক্ষ্য করুন:

## সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان:

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন খালাফ কুরাশী জুমাহী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কুরাইশদের বনু জুমাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বিদায় হজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জমাদিউল উখরা ৩৬ হিজরীতে জঙ্গে জামালে শাহাদাতবরণ করেন।

(আল-আসাবা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩)

(২) হযরত আব্দুর রহমান বিন সায়েব মাখযূমী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কুরাইশ গোত্রের শাখা বনু মাখযূমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনিও মক্কা বিজয় এবং বিদায় হজে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জমাদিউল উখরা ৩৬ হিজরীতে জঙ্গে জামালে শাহাদাত লাভ করেন। (আল-আসাবা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৬০)

## আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام:

(৩) হযরত সৈয়দ হায়দার ওলিউল্লাহ কাদেরী জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত এই বুযুর্গ ইরাকের বাগদাদে গাউসে আযমের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩ জমাদিউল উখরা ১০৩৩ হিজরীতে ওফাত পান। ভারতের কর্ণাটকের এহসানাবাদের নিলঙ্গায় তাঁর মাযার জনসাধারণের মিলনকেন্দ্র। তিনি ওলিয়ে কামিল, আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও কারামতের অধিকারী এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। বিজাপুর সালতানাতের সুলতান ইবরাহীম আদিল শাহ সানী তাঁর মুরীদ ছিলেন।

(তাযকিরাতুল আনসাব, পৃষ্ঠা: ১২২-১২৩)

(৪) দেওয়ান শাহ আব্দুল বাক্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওলিয়ে কামিল এবং সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৮ জমাদিউল উখরা ১০৭২

হিজরীতে তাঁর ওফাত ঘটে। রাওয়াল পিন্ডি জেলার গুজর খান তাহসিলের বিওল মৌজায় তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত। তিনি দেওয়ান হুযূরী শায়খ আব্দুল্লাহ কাদেরী সোহাভীর খলীফা ছিলেন। শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ তাঁর শাহজাদা ও স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হন।

(গুজর খান কে সোহরাওয়ার্দী মাশায়িখ, পৃষ্ঠা: ২৫-২৬)

(৫) শায়খে তরীকত শায়খ সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আল্লাল হাসানী ইয়ামলাহী ওয়াযযানী ফাসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পশ্চিমের (মরক্কোর) ফাসের এক ইলমী ও রূহানী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সনদপ্রাপ্ত আলিমে দ্বীন ও ফক্বীহ, অধিক ইবাদতগুজার, সিলসিলায়ে ওয়ায্যানিয়ার শায়খে তরীকত এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। ২৯ জমাদিউল উখরা ১৩৩৫ হিজরীতে তাঁর ওফাত ঘটে এবং ফাসের রওযা বাবে অজীসায় তাঁকে দাফন করা হয়।

(মু'জামুশ শুয়ূখ আল-মুসাম্মা রিয়াদুল জান্নাহ, পৃষ্ঠা: ৫৮-৬০)

(৬) হযরত পীর সৈয়দ ইমাম আলী শাহ জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুশাব জেলার ওয়ান সকেসরের কাফরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬ জমাদিউল উখরা ১৩৪৪ হিজরীতে ১০৫ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেন। খুশাব জেলার জাব্বী শরীফে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি খাজা সুলাইমান তাওনসভীর মুরীদ ও খলীফা, প্রখ্যাত আবেদ ও যাহেদ, দরবারে আলিয়া জাব্বী শরীফের প্রতিষ্ঠাতা, অধিক তিলাওয়াতকারী এবং মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। জীবনের শেষ বছরেও বার্ধক্য ও চরম দূর্বলতা সত্ত্বেও তিনি মাহে রমযানের পূর্ণ রোযা রেখেছিলেন।

(খুশাব সারযমীনে আউলিয়া, পৃষ্ঠা: ১৭৩-১৭৮)

(৭) প্রফেসর আবিদ হাসান ফরিদী জামাআতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বীনি ও পার্থিব শিক্ষায় ভূষিত, আগ্রার সেন্ট জন্স কলেজের প্রফেসর ও ফারসি বিভাগের প্রধান, আমীরে মিল্লাতের মুরীদ ও খলীফা, সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং কাশফের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন। ৪ জমাদিউল উখরা ১৩৬৪ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন এবং ভারতের ইউপির আগ্রায় সৈয়দ আবুল উলার মাযারের নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।

(তাযকিরায়ে খুলাফায়ে আমীরে মিল্লাত, পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৩৯)

(৮) হযরত মাওলানা পীর সূফী কেফায়েত আলী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভারতের ইউপির বিলগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২ জমাদিউল উখরা ১৩৮৯ হিজরীতে করাচিতে ওফাত লাভ করেন। করাচির পিআইবি কলোনির কাদেরী মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি সৈয়দ জুম্মান মিয়া শাহজাহানপুরীর মুরীদ ও খলীফা, অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার, বহু কিতাব ও পুস্তিকার প্রণেতা, বিনয়ী, তাওয়াক্কুলকারী এবং নিরহংকারী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অগণিত মুরীদদের মধ্যে বিচারপতি মুফতী সৈয়দ শুজাআত আলী কাদেরী এবং মাওলানা সৈয়দ সাআদাত আলী কাদেরীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

(তাযকিরায়ে আউলিয়ায়ে সিন্ধ, পৃষ্ঠা: ২৬৯-২৭০)

## ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ:

(৯) ইমাম আবু উসমান আমর বিন আসিম কিলাবী ক্বায়সী বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া আযদী বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট

থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারীগণের অন্যতম। বসরার বুকে জমাদিউল উখরা ২১২ বা ২১৩ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। (আল হিদায়াতু ওয়ার রুশাদ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৪৮; আসামী শুয়ূখিল বুখারী লিস-সাগানী, পৃষ্ঠা: ১৭২)

(১০) শায়খুল ইসলাম হযরত আবু ইসহাক্ব ইব্রাহীম ফিরোযাবাদী শিরাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩৯৩ হিজরীতে ইরানের ফিরোযাবাদে (ফার্স প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১ জমাদিউল উখরা ৪৭৬ হিজরীতে বাগদাদে ওফাত লাভ করেন। ইরাকের বাগদাদের বাবে আবরাযে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ফিক্বহে শাফেয়ীর মুজতাহিদ, আমীরুল মুমিনীন ফিল ফিক্বহ, বহু গ্রন্থের প্রণেতা, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, প্রাঞ্জলতা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের সমন্বিত ব্যক্তিত্ব এবং বাগদাদের মাদরাসায়ে নিজামিয়ার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। 'اَلنُّكَتُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَف' তাঁর এক অনন্য ইলমী স্মারক। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ৭-১২)

(১১) উস্তাযুল হুফফায মাওলানা হাফেয গোলাম হাবীব নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চকোয়াল জেলার লাওয়ার নিকটবর্তী দারবাত্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ জমাদিউল উখরা ১৩৮৪ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। মিয়াঁওয়ালী জেলার ঢারানকাতে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি প্রাজ্ঞ হাফিযে কুরআন, অনন্য শিক্ষক, হযরত পীর শাহ মুহাম্মদ নকশবন্দী (দরবারে আলিয়া দান্দাহ শাহ বিলাওয়াল, চকোয়াল জেলা) এর মুরীদ, আশিক্বে কুরআন, অগণিত শাগরেদের উস্তাদ, আত্মমর্যাদাবান, দানশীল এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করে সর্বদা হকের পক্ষে অবিচল থাকা ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

(তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত মিয়াঁওয়ালী, পৃষ্ঠা: ২৪৫-২৪৬)

(১২) ক্বায়েদে মিল্লাত হযরত মাওলানা হাসান রযা তাজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩৬৬ হিজরীতে ভারতের ইউপির আমেথি জেলার রওশনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলিমে দ্বীন, জামিয়া আরাবিয়া সুলতানপুরের অধ্যক্ষ, সদরুস সায়্যিদীন আল্লামা সৈয়দ গোলাম জিলানী মিরাঠীর বিশিষ্ট ছাত্র, বাবা আব্দুস সামাদ তাজীর মুরীদ, দরবারে আলিয়া বেরেলী শরীফের খলীফা এবং আমেথি জেলার কাসিমপুরা গান্ধী নগর জায়িসের 'মাদরাসা তাজুল উলূম সামাদিয়া' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ২২ জমাদিউল উখরা ১৪৩৯ হিজরীতে তাঁর ওফাত ঘটে এবং উল্লেখিত মাদরাসার প্রাঙ্গণেই তাঁকে দাফন করা হয়।

(ক্বায়েদে মিল্লাত, হায়াত ও খেদমত, পৃষ্ঠা: ১৯-৪০)

(১৩) হযরত শায়খ রাদীন আসনাভী বিন আব্দুল্লাহ কুদুস জাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১২৮১ হিজরীতে ইন্দোনেশিয়ার সেন্ট্রাল জাভার কুদুসের নিকটবর্তী দামারান গ্রামের এক ইলমী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫ জমাদিউল উখরা ১৩৭৮ হিজরীতে ওফাত পান। তিনি মহান আলিম, যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা, মসজিদে হারাম মক্কা মুকাররমার ফাযেল, উস্তাযুল ওলামা, সুফিয়ে বা-সফা, স্বদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর মুজাহিদ, 'মাদরাসা মাহাদুল ইসলামী কুদুস' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ইন্দোনেশিয়ার 'জমিয়তে নাহদাতুল ওলামা' এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

(আল-মুখতাসারুল হাবী, পৃষ্ঠা: ১৩১-১৩২)



# ইসলাম ও ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ (২য় পর্ব)

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিশে শূরার নিগরান মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

আল্লাহ পাক ইসলামী শিক্ষাকে এমন এক বিশ্বজনীন বিস্তৃতি, গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করেছেন যে, এতে স্বীয় অনুসারীদের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ ও বিকাশের জন্য একটি সুদৃঢ় ও কল্যাণকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এই ব্যবস্থায় অন্তরের পর্যবেক্ষণ যেমন রয়েছে, তেমনি আমলের নিয়মানুবর্তিতাও রয়েছে; নফসের প্রশিক্ষণ যেমন রয়েছে, তেমনি সৎসঙ্গ নির্বাচনও রয়েছে; অভ্যাসের সংশোধন যেমন রয়েছে, তেমনি অবিরাম আত্মপর্যালোচনাও রয়েছে। যেন ইসলাম মানুষকে কেবল লক্ষ্যের কথাই বলে না, বরং লক্ষ্যে পৌঁছার পথও প্রদর্শন করে। কেননা ব্যক্তিত্বের বিকাশ আকস্মিকভাবে ঘটে না; বরং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনভাবে তা সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ ইসলাম শুধু এটিই বলে না যে, ভালো মানুষ হয়ে যাও, বরং ভালো হওয়ার উপায় ও পথও প্রদর্শন করে।

মনে রাখবেন! ব্যক্তিত্বের বিকাশ কেবলই একটি সুন্দর ইচ্ছা নয় যে, মানুষ চাইল আর হুট করে তার মেজাজ, অভ্যাস ও চরিত্রে বিপ্লব ঘটে গেল। ব্যক্তিত্ব গড়েও ওঠে, বিনষ্টও হয় এবং বিকশিতও হয়। মানুষের প্রাত্যহিক রুটিন, তার সঙ্গ, তার চিন্তা, তার প্রতিক্রিয়া, তার সিদ্ধান্তসমূহ এবং বারবার পুনরাবৃত্ত আমলসমূহ ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিত্বকে রূপ দান করে। এজন্য কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে উৎকৃষ্ট করতে চায়, তবে তার জন্য শুধু এতোটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয় যে, ভালো মানুষ কেমন হয়; বরং এটিও জানা জরুরী যে, ভালো মানুষ হওয়ার জন্য বাস্তবিকভাবে কী কী করা প্রয়োজন? কখনো কখনো থিওরি তো উপস্থিত থাকে, কিন্তু যখন তা প্র্যাকটিক্যাল (বাস্তবে প্রয়োগ) করা হয় তখন সেই ফলাফল অর্জিত হয় না, যার জন্য প্র্যাকটিক্যাল করা হয়েছিল। কিন্তু ইসলামকে আল্লাহ পাক এমন উজ্জ্বল ও নিখুঁত শিক্ষা দান করেছেন যে, যখনই, যেখানেই তা গ্রহণ করা হয়েছে, তার ফলাফল সর্বদা দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো ঠিক তেমনি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে, যেমন মধ্যাহ্নের সূর্য সমুজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে থাকে।

## চিন্তা ও মননের বিকাশ

মানুষের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার চিন্তা। মানুষ যেমন চিন্তা করে, তেমনই দেখে, তেমনই বোঝে এবং পরিশেষে তেমনই আমল করে। এজন্য ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণ যদি কাঙ্ক্ষিত হয়, তবে কেবল অভ্যাস ও বাহ্যিক আচরণের সংস্কারই যথেষ্ট নয়; বরং চিন্তার সংস্কারও অপরিহার্য। ইসলাম মানুষকে বুঝে মেনে নেওয়ার, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার এবং প্রজ্ঞার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মানুষে পরিণত করে। এটিই ইসলাম, যা মানুষকে আবেগতাড়িত, গভীরতাহীন ও অন্ধ অনুকরণের চিন্তা থেকে বের করে কুরআন ও হাদীস এর দিকনির্দেশনায় চিন্তা-ভাবনা, আত্মস্থকরণ, অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তিত্বে রূপায়িত করে। সে যখনই কুরআন পাকের তিলাওয়াত করে, তখন اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ، اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ এর মতো আয়াতসমূহ তার চিন্তাভাবনাকে সুদৃঢ় করে এবং তার মাঝে এমন দূরদর্শিতা সৃষ্টি করে যে, সে প্রতিটি চকচকে বস্তুকে সোনা মনে করে না; প্রতিটি প্রচলিত ও বিখ্যাত কথাকে সঠিক বলে মেনে নেয় না; প্রতিটি ভাইরাল সংবাদকে সত্য মনে করে না; প্রতিটি ব্যক্তির অভিমতকে দলিলের মর্যাদা দেয় না; বরং সে চিন্তা করে, যাচাই করে, অনুসন্ধান করে এবং অতঃপর মতামত গঠন করে। ইসলাম তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্যের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মুসলমানের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে। যখন অন্তর পরিশোধিত হয় তখন চিন্তা ও চেতনা শুদ্ধ হয়; চিন্তা শুদ্ধ হলে আমল সুন্দর হয়; এরপর অভ্যাসে পরিণত হয়; অভ্যাস চরিত্র গঠন করে; চরিত্র ব্যক্তিত্ব তৈরি করে এবং মার্জিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গই উন্নত সমাজ বিনির্মাণ করে।

## চরিত্রের বিকাশ

ইসলামী শিক্ষা বান্দাকে চরিত্রবান করে তোলে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে অপূর্ণাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ صَالِحَ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। (মুসনাদে আহমদ, ১৪/৫১৩, হাদীস: ৮৯৫২)

মনে রাখবেন! চারিত্রিক বিকাশ বলতে মানুষের ভেতরে এমন উত্তম গুণাবলী, অভ্যাস ও আচরণের বিকাশ বোঝায়, যা তাকে নিজ রবের সাথে, নিজের সত্ত্বার সাথে এবং অন্যান্য মানুষের সাথে উত্তম সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম করে তোলে। এতে কেবল "উত্তম ব্যবহার"-ই অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং মানুষের সামগ্রিক নৈতিক ব্যক্তিত্ব শামিল রয়েছে। বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ জানে যে ইলম মানুষকে অনন্য করতে পারে, সম্পদ তাকে সচ্ছল বানাতে পারে, পদমর্যাদা তাকে প্রভাবশালী করতে পারে এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য তাকে মানুষের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় করতে পারে; কিন্তু মানুষের অন্তরে জায়গা করে নেওয়া, বিশ্বাস অর্জন করা এবং অন্যদের জন্য প্রশান্তির মাধ্যম হওয়ার যোগ্যতা সাধারণত সচ্চরিত্রই দান করে। সত্যবাদিতা, আমানতদারী, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, লজ্জা, বিনয়-নম্রতা, সহনশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমা ও মার্জনা, দানশীলতা, আত্মত্যাগ, দয়া ও স্নেহ, কল্যাণকামনা, সুধারণা, ন্যায়বিচার এবং

হক্কুল ইবাদের হেফাযতের মতো গুণাবলী যখন মানুষের মেজাজের অংশে পরিণত হয়, তখন তার ব্যক্তিত্বে এমন এক রূপ-লাবণ্য প্রস্ফুটিত হয় যা বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়েও বহুগুণ বেশি স্থায়ী ও কার্যকর।

উত্তম চরিত্র মানুষকে কেবল অন্যদের নিকট প্রিয়ই করে তোলে না, বরং তাকে নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে, আবেগকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজের মর্যাদা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখার ক্ষমতা দান করে। এই কারণেই চারিত্রিক বিকাশকে ব্যক্তিত্বের বিকাশের স্রেফ একটি অংশ নয়, বরং তার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ বলা যেতে পারে। কারণ মানুষের বাতেন (ভেতর) যতোই সুন্দর হোক না কেন, তার সুবাস অন্যদের নিকট কেবল তখনই পৌঁছায় যখন তা তার চরিত্র, কথাবার্তা এবং আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায়। এভাবে চরিত্র মানুষের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাকে তার বাহ্যিক দিকের সাথে মিলিয়ে দেয় এবং তার অস্তিত্বকে নিজের জন্যও প্রশান্তির এবং অন্যদের জন্যও কল্যাণের মাধ্যম বানিয়ে দেয়।

এভাবে বলা যায় যে ঈমান মানুষকে ভেতর থেকে গড়ে তোলে, ইবাদত তাকে প্রশিক্ষণ দান করে এবং সচ্চরিত্র সেই সৌন্দর্যকে অন্যদের সামনে চরিত্রের রূপরেখায় উন্মোচিত করে। ইসলাম আরবের যুদ্ধ প্রিয়, রুক্ষ স্বভাবের, উদ্ধত ও উগ্র মেজাজের মানুষদের কীভাবে আরব ও অনারবের কাছে ঈর্ষণীয় আদর্শে পরিণত করেছিল? কোন পাঠ্যক্রম ছিল যা তাদের আমূল বদলে দিয়েছিল? এই আলোকোজ্জ্বল ও মার্জিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানবগণ কোন কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন যে আজ যুগ তাঁদের উদাহরণ পেশ করে? সেই দ্রুত কার্যকর পাঠ্যক্রমের একটি ঝলক প্রত্যক্ষ করুন, যাতে আমাদের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় যে আমরা যদি ব্যক্তিত্বের বিকাশ চাই, তবে ইসলামী শিক্ষাকেই গ্রহণ করতে হবে।

## ব্যক্তিত্ব বিকাশের ইসলামী পাঠ্যক্রম

বাদশাহ নাজ্জাশী যখন মুসলমানদের জিজ্ঞেস করলেন: এটি কোন দ্বীন, যার কারণে তোমরা নিজেদের সম্প্রদায়কে ছেড়ে এসেছ (অর্থাৎ হিজরত করেছ), অথচ আমার দ্বীনেও প্রবেশ করোনি এবং এদের মধ্য থেকে কোনো জাতির ধর্মও গ্রহণ করোনি? তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত জাফর বিন আবি তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নাজ্জাশীর সাথে কথোপকথন করলেন এবং বললেন: হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞ ও মূর্খ ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণী খেতাম, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার কাজ করতাম। রক্তসম্পর্ক ছিন্ন করা এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা আমাদের স্বভাব ছিল। শক্তিশালীরা দুর্বলদের অধিকার ছিনিয়ে নিত। আমরা যখন এই সকল বিভ্রান্তির আঁধারে নিমজ্জিত ছিলাম, তখন আল্লাহ পাক আমাদের মাঝে একজন রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশমর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী এবং নিষ্কলুষ পবিত্রতা খুব ভালোভাবেই জানি। তিনি আমাদের আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও ইবাদতের দিকে আহ্বান জানালেন এবং নির্দেশ দিলেন যেন আমরা কেবল এক খোদারই ইবাদত করি এবং সেই পাথর ও

প্রতিমাসমূহ বর্জন করি যাদের পূজা আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা করত। অধিকন্তু তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, আমানত ফিরিয়ে দিতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে, হারামকৃত বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে এবং রক্তপাত বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন; আর অশ্লীলতা, মিথ্যাচার, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা এবং সতী নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা কেবল আল্লাহ পাকেরই ইবাদত করি, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না বানাই; তাছাড়া তিনি আমাদের নামায আদায় করতে, যাকাত প্রদান করতে এবং রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে হযরত জাফর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বহুবিধ ইসলামী বিষয়াদি বর্ণনা করার পর বললেন: অতঃপর আমরা তাঁর সত্যায়ন করলাম, তাঁর উপর ঈমান আনলাম এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করলাম। আমরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করলাম এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করলাম না। তিনি যা আমাদের উপর হারাম করেছেন আমরা তা হারাম হিসেবে গণ্য করেছি এবং যা হালাল করেছেন তা হালাল জেনেছি। ফলে এ কারণে আমাদের সম্প্রদায় আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তারা আমাদের নানা রকম নির্যাতন করল এবং দ্বীনের বিষয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করল, যাতে আমরা আল্লাহ পাকের ইবাদত পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় ফিরে যাই এবং অপবিত্র বিষয়গুলোকে পুনরায় হালাল মনে করি। তারা যখন আমাদের উপর সীমাহীন নির্যাতন চালাল, জুলুমের পাহাড় চাপিয়ে দিল, আমাদের চলার পথ সংকুচিত করে দিল এবং আমাদের ও আমাদের দ্বীনের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল, তখন আমরা আপনার দেশের উদ্দেশ্যে বের হয়ে এলাম। হে বাদশাহ! এই আশায় যে আপনার আশ্রয়ে আমাদের উপর কোনো জুলুম করা হবে না, আমরা অন্যদের ছেড়ে আপনার দেশকে পছন্দ করেছি এবং আপনার সান্নিধ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

হযরত জাফর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরও আলোচনা করলেন, যা শুনে বাদশাহ নাজ্জাশী নিজের একটি আকাঙ্ক্ষা এভাবে প্রকাশ করলেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আল্লাহর সেই সত্য রাসূল, যাঁর সুসংবাদ হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام পবিত্র ইঞ্জিলে দিয়েছিলেন। আর আমি যদি রাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুযায়ী রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে বাধ্য না হতাম, তবে আমি নিজে মক্কা মুকাররমায় গিয়ে সেই সর্বশেষ নবী (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর নালাইন শরীফ সোজা করে দিতাম এবং তাঁর মুবারক কদম ধুয়ে দিতাম। (মুসনাদে আহমদ, ৩৭/১৭০, হাদীস: ২২৪৯৮)

হযরত জাফর বিন আবি তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই ঐতিহাসিক ভাষণ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম বর্ণনা করে দিয়েছে, যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূলভিত্তি। অতএব চিন্তা, চেতনা এবং চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতার জন্য ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করুন; যাতে ব্যক্তির উৎকর্ষের পাশাপাশি সমাজের বুকেও পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য ও বিকাশ নেমে আসে।

# কন্যাদের গৃহস্থালি কাজ শেখান



উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

সংসার পরিচালনার জন্য উপকরণের সংস্থান করা পুরুষের যিম্মাদারী, আর সেই উপকরণের মাধ্যমে গৃহের যাবতীয় বিষয়াদি সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা নারীর উপর নির্ভরশীল। অতএব এ বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন যে, আমরা এখন থেকেই আমাদের কন্যাদেরকে এমন ধাঁচে প্রশিক্ষিত করব, যাতে তারা ভবিষ্যতে যে গৃহেরই শোভা বৃদ্ধি করুক না কেন, তারা যেন নিজেদের নৈতিক ও শরয়ী যিম্মাদারী অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্পাদন করতে পারে।

আর এই যিম্মাদারী যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো; "দৈনন্দিন কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করা।"

যে নারী নিজের প্রাত্যহিক কাজকর্ম যতো বেশি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে জানবে, তার ঘর ততোটাই পরিপাটি, সুসজ্জিত এবং প্রশান্তিময় হবে।

অতএব একজন মায়ের উচিত শৈশব থেকেই ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই ঘরের ছোটখাটো কাজকর্মে অভ্যস্ত করে তোলা; যেমন: জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজেদের আলমারি পরিষ্কার রাখা, নিজেদের জুতো ও কাপড় পরিপাটি করে রাখা, চা, লাচ্ছি, শরবত ইত্যাদি প্রস্তুত করতে শেখা, ছোট মেয়েদের দিয়ে হালকা থালাবাসন ধৌত করানো, হালকা ঝাড়ু দেওয়ানো, ছোটখাটো কাপড়, যেমন টুপি, মোজা, রুমাল, স্কার্ফ ইত্যাদি ধৌত করানো।

শাকসবজি কাটার সময় তাদেরকে কাছে বসিয়ে রাখা উচিত, যাতে পালং শাক, ঢেঁড়শ ইত্যাদি পরিষ্কার ও কাটার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং রসুন, আদা ছিলা ও বাটা শিখতে পারে।

আর মেয়েরা যখন ১৪-১৫ বছর বয়সী হয়ে যাবে, তখন থেকেই তাদেরকে রান্নাবান্না শেখানো শুরু করে দেওয়া উচিত।

এটাই সেই বয়স যাতে যেকোনো নতুন কাজ করা ও শেখার তীব্র আগ্রহ থাকে। মেয়েদের স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে বোঝানো উচিত যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদরের কন্যা, শাহজাদীয়ে

কাওনাইন বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নিজের ঘরের কাজকর্ম নিজ হাতেই করতেন। এ থেকে জানা গেল যে. ঘরের কাজকর্ম নিজ হাতে করা, ঝাড়ু দেওয়া, ঘর মোছা ইত্যাদি সম্মানহানির কোনো কাজ নয়; বরং এটি তো শাহজাদীয়ে কাওনাইনের মুবারক পদ্ধতি! আর আপনারা যদি তাঁর পদ্ধতির উপর আমলের নিয়তে এই কাজগুলো করেন, তবে সাওয়াবের অধিকারীও হবেন।

কোনো প্রকার মানসিক চাপ ছাড়াই ঘরকে সহজে পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল রাখার জন্য কন্যা সন্তানদের নিম্নোক্ত ছোট ছোট অভ্যাসগুলোকে স্থায়ীভাবে গড়ে তোলার মানসিকতা দান করুন:

(১) সকালে ঘুম থেকে উঠেই সর্বপ্রথম নিজের বিছানা পরিপাটি করে নেওয়া। বিশ্বাস করুন! দুই মিনিটের এই সামান্য কাজের বদৌলতে আপনার কক্ষটি ৮০ শতাংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রূপ প্রদর্শন করতে শুরু করে; পক্ষান্তরে এলোমেলো বিছানা পুরো কক্ষের বিশৃঙ্খলার নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পক্ষ থেকে আমাদের যে ৬৩টি নেক আমলের পুস্তিকা প্রদান করা হয়েছে, তাতে একটি নেক আমল এটিও রয়েছে: "আপনি কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত এবং পরিপাটি সুশৃঙ্খল?"

(২) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে গড়িমসি করলে ময়লা-আবর্জনা জমে যায়; এজন্য ছোটখাটো কাজ তৎক্ষণাৎ সেরে ফেলা, যেমন বাথরুম বা রান্নাঘরের সিঙ্ক ব্যবহারের সাথে সাথেই তা পরিষ্কার করে নেওয়া। অন্যথায় পানি ও সাবানের দাগ শুকিয়ে জমে শক্ত হয়ে যায়।

(৩) প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা যাতে জিনিসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না থাকে; যেমন ময়লা কাপড় জমিন বা চেয়ার ইত্যাদির উপর ফেলার পরিবর্তে সাথে সাথে কাপড় রাখার ঝুড়িতে রাখা।

(৪) অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জমা করে রাখা থেকে বেঁচে থাকা এবং নিয়মিতভাবে জিনিসপত্র আলাদা করা। "একটি ভেতরে তো একটি বাইরে" এই মূলনীতি গ্রহণ করুন; যেমন: নতুন পোশাক, নতুন জুতো বা নতুন তৈজসপত্র কেনার সাথে সাথেই পুরনো জিনিসটি কোনো অভাবী মানুষকে দিয়ে দিন কিংবা রিসাইকেল করে নিন। এভাবে ঘরে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। এজন্য ঘরের এক কোণে একটি বাক্স রাখুন, যেখানে আপনারা সেই জিনিসগুলো রাখতে থাকবেন যা আর ব্যবহার করা হয় না; যখন বাক্সটি পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তা কোনো অভাবী মানুষকে দিয়ে দিন। এই অভ্যাসটি ঘরকে সুশৃঙ্খল রাখতে অত্যন্ত সহায়ক হয়।

(৫) যদি কেবল রান্নাঘর, বাথরুম এবং উঠানকে সুশৃঙ্খল করে নেওয়া যায়, তবে পুরো ঘরই সুশৃঙ্খল পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। এজন্য উঠান, রান্নাঘর এবং ঘরের প্রবেশদ্বার, যেখানে ধূলিবালি জমতে থাকে, প্রতিদিন এক থেকে দু'বার ঝাড়ু দিয়ে নিলে সামান্য পরিশ্রমেই তা যথেষ্ট পরিষ্কার রাখা সম্ভব।

অনুরূপভাবে জরুরী হলো রান্নাঘরে রান্নার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার কাজও চালিয়ে নেওয়া; যেমন: যখন শাকসবজি সিদ্ধ হচ্ছে কিংবা

তরকারি রান্না হচ্ছে, সেই কয়েক মিনিটে ব্যবহৃত থালাবাসন ধুয়ে নেওয়া যায় এবং কিচেন কাউন্টার পরিষ্কার করে ফেলা যায়। এমনটি করলে খাবারের পর পাহাড়সম থালাবাসনের স্তূপ জমে না এবং রান্নাঘরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। একইভাবে রাতেও থালাবাসন ইত্যাদি ধুয়ে সিঙ্ক সম্পূর্ণ খালি করে রাখুন।

ঘুমানোর পূর্বে পুরো ঘরটি একবার ঘুরে দেখে নিন এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র তাদের যথাস্থানে রেখে দিন। এভাবে সকালে একটি সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি ঘর আপনার অপেক্ষায় থাকবে, যা আপনাকে মানসিক প্রশান্তি দেবে এবং আপনার দিনের সূচনাটিই হবে পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলভাবে।

একজন মুসলিম নারীর জন্য শাহজাদীয়ে কাওনাইন হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا সর্বোত্তম আদর্শ (Role model)। তিনি নিজের গৃহস্থালি কাজকর্মকে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সুশৃঙ্খল রেখেছিলেন; যদিও পার্থিব দিক থেকে সে যুগে গৃহস্থালির কাজে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আজকের মতো সুযোগ-সুবিধাও বিদ্যমান ছিল না। তা সত্ত্বেও সমস্ত গৃহস্থালি কাজের সাথে সাথে ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত, স্বামীর খেদমত এবং সন্তানদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

আল্লাহ পাক আমাদের তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক্ব দান করুন।

**ওহী হে রাহ তেরে আযম ও শওক্ব কি মঞ্জিল**
**জাহাঁ হে আয়েশা ও ফাতেমা কে নক্বশে ক্বদম**

রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে এই তাসবীহ পাঠ করার শিক্ষা দান করেছেন:

৩৩ বার سُبۡحَانَ اللّٰہِ, ৩৩ বার اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ এবং ৩৪ বার اَللّٰہُ اَکۡبَر; এবং ইরশাদ করেন যে, এটি তোমার জন্য একজন খাদেম অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী, ৩/৫১৬, হাদীস: ৫৩৬২)

এই মহান আমলটিকে 'তাসবীহে ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا' বলা হয়। এটি সকল সিলসিলায়ে তরীকতে, বিশেষ করে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায়ও একটি নিয়মিত আমল এবং বরকতের মাধ্যম।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'মিরকাতুল মাফাতীহ শারহে মিশকাতিল মাসাবীহ'-এ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যে তাসবীহ পাঠের শিক্ষা দান করেছেন, তাতে এই হিকমতও রয়েছে যে, ঘুমানোর সময় এই তাসবীহ পাঠ করলে সারাদিনের কাজকর্মের ক্লান্তি ও ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে যায়। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/২৩৩)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ইসলামী বোনেদের ৬৩টি নেক আমলের মধ্য থেকে একটি নেক আমল এটিও রয়েছে:

"আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর কমপক্ষে একবার আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا পড়েছেন?"

নিয়ত করুন! নামাযের পর তাসবীহর এই বরকতময় আমলটি গ্রহণ করবেন এবং ঘুমানোর পূর্বে তাসবীহে ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا পাঠ করে নিজের অন্তরকে যিকিরে ইলাহী দ্বারা আলোকিত করবেন।



# ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়িল

মুফতী মুহাম্মদ হাশিম খাঁন আত্তারী মাদানী

**(১) ভ্রু রঙ করা এবং ছাঁটার শরয়ী বিধান**

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আজকাল মহিলারা "আইব্রো টিন্ট" (Eyebrow Tint) করানোর ক্ষেত্রে ভ্রুতে রঙ (ডাই) করে থাকে এবং এই রঙ ভ্রুর চুলের রঙের অনুরূপই করা হয়; যেমন: চুল কালো হলে কালো রঙের শেড ব্যবহার করে, যাতে চেহারার বাকি অংশের (যেমন: গাল, নাক, চিবুক ও ঠোঁট) মতো এর সৌন্দর্য ও নকশাকেও ফুটিয়ে তোলা যায় এবং আকর্ষণীয় করা যায়। এটি সাধারণত পানি পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে না, তবে এর কোনো কোনো প্রকার পানি রোধকারীও হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক সময় ভ্রুকে বিশেষ আকৃতি ও নকশা দেওয়ার জন্য আশপাশ থেকে কিছু চুল বা লোম ছাঁটাও হয়। এই বর্ণনার আলোকে অনুগ্রহ করে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন যে, এই কাজ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরীয়তের দৃষ্টিতে কালো রঙ ব্যতীত অন্যান্য রঙ দিয়ে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে ভ্রু রঙ করা নিষিদ্ধ নয়; যেমন মাথার চুলে কালো খেযাব ছাড়া মেহেদী দিয়ে রঙ করা জায়িয। এই বিবেচনায় আইব্রো টিন্ট (Eyebrow Tint)-এ কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এখানে অতিরিক্ত দুটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক:

(১) এই প্রক্রিয়ায় যেন ভ্রুর লোম/ চুল কাটা বা ছাঁটা না হয়; কেননা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রুর চুল কাটা জায়িয নয়।

(২) এই কালার ব্যবহারের ফলে ভ্রুর লোমে বা শরীরে যেন এমন কোনো স্তর না পড়ে, যা নিচে পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ শরীরে এমন কোনো জিনিস লাগানো; যা অযু ও ফরয গোসলে বাধা সৃষ্টি করে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও নাজায়িয; যেমনটি ওলামায়ে কিরাম নেইলপলিশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই হুকুম দিয়েছেন। হ্যাঁ, মেকআপ ইত্যাদির এমন স্তর যা চেহারা ধৌত করলে সহজেই উঠে যায়, তা নিষিদ্ধ নয়।

**নোট:** ভ্রুর লোম যদি এতো বেশি বড় হয়ে যায় যার কারণে চেহারা আসলেই কুৎসিত দেখায়, তবে কেবল সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লোমগুলোকে এতোটুকু কেটে ছোট করা যেতে পারে যাতে কুৎসিত ভাব দূর হয়ে যায়।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## (২) সজ্ঞান অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের সাথে হজ্ব করার শরয়ী বিধান

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, এক নারীর স্বামী কিছুদিন পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। তার ওয়ারিশদের মধ্যে একজন বিধবা স্ত্রী এবং একজন সজ্ঞান পুত্র রয়েছে, যার বয়স ১৩ বছর, কিন্তু সে অপ্রাপ্তবয়স্ক। ছেলেটি তার বয়স অনুপাতে সজ্ঞান ও নির্ভরযোগ্য; অর্থাৎ সে লজ্জাশীল এবং পর্দার বিষয়াদী বোঝার মতো বোধসম্পন্ন। স্বামীর উত্তরাধিকার থেকে অংশ পাওয়ার কারণে বিধবা নারীর উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেছে। জানার বিষয় হলো, এই নারী কি তার ১৩ বছরের ছেলের সাথে হজ্বে যেতে পারবেন?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

প্রথমত এটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো নারীর জন্য স্বামী বা মুহরিম ব্যতীত শরয়ী দূরত্ব অর্থাৎ ৯২ কিলোমিটার বা তার বেশি দূরবর্তী কোনো স্থানে গমন করা হারাম। সাথে গমনকারী মুহরিমের সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া অথবা মুরাহিক্ব এবং নির্ভরযোগ্য (অর্থাৎ ফাসেক্ব ও বেপরোয়া নয় এমন) হওয়াও আবশ্যক। 'মুরাহিক্ব' অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী এমন বালক যার সমবয়সীমা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে এবং এর বয়সসীমা হলো বারো বছর; এই বিষয়ে সেও প্রাপ্তবয়স্কের হুকুমে গণ্য। অতএব জিজ্ঞাসিত অবস্থায় উল্লেখিত নারীর তেরো বছর বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেও মুরাহিক্ব ও নির্ভরযোগ্য; যার কারণে এই নারীর জন্য নিজ পুত্রের সাথে হজ্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়িয।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## (৩) গায়রে মুহরিমের উপস্থিতিতে তায়াম্মুম করে আদায়কৃত নামাযের বিধান

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি একটি মাসআলা পড়েছিলাম, যদি কোনো নারীকে অযু করতে হয় এবং সেখানে কোনো গায়রে মুহরিম পুরুষ উপস্থিত থাকে যার থেকে গোপন রেখে হাত ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করা সম্ভব না হয়, তবে সে তায়াম্মুম করে নেবে। আমার প্রশ্ন হলো, কোনো নারী যদি এভাবে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেয়, তবে পরবর্তীতে কি সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে কি না?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় সেই নারীর উপর পুনরায় অযু করে নামায আদায় করা আবশ্যক নয়। কারণ মূলনীতি হলো; যে অপারগতার কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছে, সেই অপারগতাটি যদি বান্দার পক্ষ থেকে হয় তবে নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক হয়। কিন্তু অপারগতাটি যদি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয় যাতে বান্দার কোনো হাত

নেই, তবে এমন অপারগতার কারণে তায়াম্মুম করে আদায়কৃত নামায পুনরায় আবশ্যক হয় না। আর জিজ্ঞাসিত অবস্থায়ও যেহেতু পরপুরুষের সামনে সতর উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হলো লজ্জা এবং আল্লাহ পাকের ভয়, আর এই উভয় বিষয় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই সৃষ্টি; অতএব এই অপারগতাটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই সাব্যস্ত হবে এবং এর কারণে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলে তা পুনরায় আবশ্যক হবে না।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## (৪) গর্ভস্থ সন্তানের ত্রুটির ক্ষেত্রে গর্ভপাতের বিধান

**প্রশ্ন:** ওলামা ও সম্মানিত মুফতীগণ এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, পাঁচ মাসের গর্ভধারণ রয়েছে। আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে বাচ্চার মস্তিষ্ক ছোট এবং পিঠে/ কোমরে টিউমার বা ফোঁড়া দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসকরা গর্ভপাত করাতে বলছেন; এই কারণে কি গর্ভপাত করানো যাবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উল্লেখিত অবস্থায় গর্ভপাত করানোর শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অনুমতি নেই। কারণ গর্ভধারণ যখন চার মাসের হয়ে যায়, তখন তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়; আর যখন রূহ ফুঁকে দেওয়া হলো তখন সে একজন জীবিত মানুষের ন্যায়। অতএব এখন গর্ভপাত করানো যেন একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার শামিল, যা মারাত্মক পর্যায়ের হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে অন্যায়ভাবে হত্যার তীব্র নিন্দা এবং তা সম্পাদনকারীর জন্য জাহান্নামের অগ্নির কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, চিকিৎসকদের বক্তব্য কিংবা আল্ট্রাসনোগ্রাফি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিশ্চিত ও চূড়ান্ত নয়। অতএব একটি অনিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে একজন জীবিত মানুষের প্রাণহানী করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। বরং তর্কের খাতিরে যদি কোনোভাবে প্রবল ধারণাও অর্জিত হয়, তবুও রূহ সঞ্চার হওয়ার পর গর্ভপাতের অনুমতি হতে পারে না। কারণ এর দ্বারা বড়জোর এতোটুকুই জানা যাবে যে, শিশুর কোনো রোগব্যাধি রয়েছে; আর অসুস্থতার কারণেও কোনো জীবিত মানুষকে হত্যা করা জায়িয নেই। হ্যাঁ, প্রাণ সঞ্চার হওয়ার পূর্বে যদি এমন কোনো সঠিক তথ্য নিশ্চিত হতো, তবে বিধান ভিন্ন হতে পারত।

কেবলমাত্র কাল্পনিক সংশয় ও অনিশ্চিত আশঙ্কার কারণে নিশ্চিত কোনো প্রাণ বিনাশ করা জায়িয নেই। ফুক্বাহায়ে কিরাম একটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, সন্তান প্রসবের সময় যদি প্রসব আটকে যায় এবং মায়ের মৃত্যুর ভয় থাকে, তবুও কেবল সেই কাল্পনিক আশঙ্কার কারণে জীবিত শিশুকে কেটে বের করার অনুমতি দেওয়া হবে না। ঠিক একইভাবে আল্ট্রাসনোগ্রাফির মতো ধারণাপ্রসূত মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য, যা নিশ্চিত ও চূড়ান্ত নয়, তার ভিত্তিতে গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না; কেননা এতেও নিশ্চিত এক প্রাণকে নিছক আশঙ্কার ভিত্তিতে হত্যা করা অবধারিত হয়ে পড়ে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নয়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মা-বাবার নামে

# শিশুদের অল্পেতুষ্টতা শেখান

মাওলানা হাফেয হাফীযুর রহমান আত্তারী মাদানী





অল্পেতুষ্টি একটি অত্যন্ত উচ্চমানের এবং চমৎকার গুণ, যা মানুষের জীবনকে প্রশান্তি ও সুখে ভরিয়ে দেয়। এটি মূলত আল্লাহ পাকের দানকৃত নেয়ামতের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নাম। বর্তমান যুগে যেখানে চারদিকে লালসা এবং অধিক সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে, সেখানে অল্পেতুষ্টতার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্পেতুষ্টতা মানুষকে হিংসা, লোভ এবং অস্থিরতা থেকে বাঁচায় এবং তাকে একটি তৃপ্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে সাহায্য করে। এই কারণেই ইসলামে অল্পেতুষ্টতাকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে সফল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নিচে দেওয়া পয়েন্টগুলোর উপর আমল করে মা-বাবা তাদের সন্তানদের মধ্যে অল্পেতুষ্টতার প্রেরণা বা উদ্দীপনা তৈরি করতে পারেন।

## অল্পেতুষ্টতা কী?

বান্দার সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে এবং সে সম্পদ পছন্দও করে, কিন্তু সে এর পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায় না। যদি সম্পদ সহজে এবং জায়িয উপায়ে অর্জিত হয় তবে খুশি মনে গ্রহণ করে; কিন্তু যদি এর জন্য অত্যধিক পরিশ্রম বা দৌড়ঝাঁপ করতে হয় যার ফলে আখিরাতের ক্ষতি হয় বা ইবাদত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সে তা ছেড়ে দেয়; এটাই অল্পেতুষ্টতা।

(দেখুন: ইহইয়াউল উলূম, ৪/৫৬৩)

মা-বাবাকে এটি স্মরণে রাখতে হবে যে, শিশুদের অল্পেতুষ্টতা শেখানো শুধু একটি নসিহত নয় বরং তাদের পুরো জীবনের ভিত্তি। যদি

শৈশবেই অন্তরে 'অল্পে সন্তুষ্ট থাকার' অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, তবে এই শিশুরাই বড় হয়ে তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ এবং সফল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে।

## অল্পেতুষ্টতা শেখানোর পদ্ধতিসমূহ

(১) অল্পেতুষ্টতার ফযিলত বর্ণনা করুন: মা-বাবাকে উচিত শিশুদের অল্পেতুষ্টতার গুরুত্ব ও ফযীলত জানানো। শিশুদের বলুন যে, ইসলাম আমাদের অল্পেতুষ্টতার শিক্ষা দেয়। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সেই বান্দা সফল হয়ে গেল, যে মুসলমান হলো এবং যাকে প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক দেওয়া হলো আর আল্লাহ পাক তাকে যা দিয়েছেন তার উপর তাকে অল্পেতুষ্টতা নসীব করেছেন।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৪০৬, হাদীস: ২৪২৬)

একইভাবে একটি হাদীসে পাকে অল্পেতুষ্টতার গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলে ইরশাদ করেন: অল্পেতুষ্টতা কখনো শেষ না হওয়া একটি ভাণ্ডার।

(আয যুহদুল কবীর লিল বায়হাকী, পৃষ্ঠা: ৮৮, হাদীস: ১০৪)

অল্পেতুষ্টতার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের কাছে দোয়ায় অল্পেতুষ্টতার প্রার্থনা করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِیْ بِمَا رَزَقْتَنِیْ وَبَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِیْ بِخَیْرٍ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা রিযিক দিয়েছ তার উপর আমাকে অল্পেতুষ্টতা নসীব করো এবং তাতে আমার জন্য বরকত দান করো, আর আমার সেই সমস্ত জিনিস যা আমার চোখের আড়ালে রয়েছে সেগুলোর কল্যাণের সাথে হিফাযত করো।

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকীম, ২/১৮৯, হাদীস: ১৯২১)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করেন: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বংশধরদের শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক দান করো।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৪০৬, হাদীস: ২৪২৭)

(২) আমলী নমুনা হোন: শিশুরা তাদের মা-বাবার অভ্যাস, চাল-চলন এবং জীবনযাপন থেকে শেখে। যদি মা-বাবা নিজেরা অল্পেতুষ্টতা পছন্দকারী হন, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে না ছোটেন এবং সাদাসিধে জীবন যাপন করেন, তবে শিশুরাও সেই পথে চলবে।

(৩) কৃতজ্ঞতার অভ্যাস গড়ে তুলুন: শিশুদের প্রাত্যহিক ছোট-বড় নেয়ামতের উপরও "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বলা শেখান। খাবার, বাসস্থান, শিক্ষা এমনকি সামান্য কোনো জিনিস পাওয়ার ক্ষেত্রেও কৃতজ্ঞতা আদায় করার প্রশিক্ষণ দিন।

(৪) ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা শেখান: প্রতিটি ইচ্ছাকে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সাথে সাথে পূরণ করবেন না। শিশুরা যখন কোনো জিনিসের জন্য জেদ ধরে, তখন তাদের বোঝান যে, প্রতিটি জিনিস সাথে সাথে অর্জন করা জরুরি নয়। কিছু জিনিস সময় বা প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

(৫) বুযুর্গদের সাদাসিধে জীবনের কাহিনী শোনান: কিচ্ছা, কাহিনী বা সাদামাটা জীবন

অতিবাহিতকারী মহান ব্যক্তিদের উদাহরণ দিন এবং কাহিনী শোনান।

(৬) অন্যদের অবস্থা দেখান: গরিব ও অভাবী মানুষের অবস্থা সম্পর্কে শিশুদের অবগত করুন, যাতে তারা নিজেদের নেয়ামতগুলোর কদর করে এবং অন্তরে অল্পেতুষ্টতা সৃষ্টি হয়।

শিশুদের বলুন যে,

✯ অল্পেতুষ্টতায় ইজ্জত রয়েছে। অল্পেতুষ্টতা অবলম্বনকারী সম্মান পায় আর লোভী মানুষ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১/১৬১)

✯ অল্পেতুষ্টতা মানুষকে লালসা ও লোভের মতো চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে বাঁচায়।

✯ অল্পেতুষ্টতার মাধ্যমে জীবনে প্রশান্তি আসে, অস্থিরতা দূর হয়।

✯ যে ব্যক্তি অল্পেতুষ্টতা অবলম্বন করে, সে অন্যদের সামনে হাত পাতা থেকে বেঁচে যায় এবং সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন অতিবাহিত করে।

✯ অল্পেতুষ্টতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিই আসলে প্রকৃত ধনী। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ধনী কে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: সেই ব্যক্তি, যে আমার দেওয়া জিনিসের উপর সবচাইতে বেশি অল্পেতুষ্টতা অবলম্বনকারী।

(ইবনে আসাকির, ৬১/১৩৯, নম্বর ৭৭৪১)

✯ অল্পেতুষ্টতা অবলম্বনকারী ব্যক্তি কখনো অকৃতজ্ঞ হয় না।

✯ সে অন্যদের প্রতি হিংসা করে না।

✯ সে জীবনে প্রশান্তি পায়।

✯ সে আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

✯ সে মানুষের উপর আশা ভরসা রাখে না।

**অল্পেতুষ্টতা না থাকার ক্ষতিসমূহ**

✯ অল্পেতুষ্টতা না থাকা মানুষকে লোভী ও অস্থির করে দেয়।

✯ সে সর্বদা অন্যদের সাথে নিজের জীবনের তুলনা করতে থাকে এবং নিজের যা কিছু ধন-দৌলত বা নেয়ামত রয়েছে তাকে তুচ্ছ মনে করে।

✯ এমন ব্যক্তিদের মধ্যে হিংসা ও প্রতিযোগিতার আগুন জ্বলে ওঠে যা সম্পর্ক নষ্ট করে এবং অন্তরকে অপছন্দনীয় আবেগে ভরিয়ে দেয়।

✯ অধিকন্তু অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছাগুলো অর্থনৈতিক বোঝা, মানসিক চাপ এবং পারিবারিক কলহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ পাক আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের অল্পেতুষ্টতা অবলম্বন করার তাওফীক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# জুমাদাল উখরার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

| তারিখ/মাস/সন | নাম/ঘটনা | বিস্তারিত তথ্যের জন্য পড়ুন |
|---|---|---|
| ১ জমাদিউল উখরা ১১০২ হি. | ওফাত দিবস: সুলতানুল আরেফীন হযরত সখী সুলতান বাহু সারওয়ারী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ | **মাসিক ফয়যানে মদীনা জমাদিউল উখরা ১৪৩৮ হি. এবং "ফয়যানে সুলতান বাহু"** |
| ৫ জমাদিউল উখরা ৬৭২ হি. | ওরস শরীফ : মাওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ রূমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ | মাসিক ফয়যানে মদীনা জমাদিউল উখরা ১৪৩৯ হি. |
| ৯ জমাদিউল উখরা ৫৪৪ হি. | ওফাত দিবস: হযরত ইমাম কাজী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ | মাসিক ফয়যানে মদীনা জমাদিউল উখরা ১৪৩৮ হি. |
| ১৪ জমাদিউল উখরা ১৮৯ হি. | ওফাত দিবস: শাগরেদে ইমামে আযম, ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ | মাসিক ফয়যানে মদীনা জমাদিউল উখরা ১৪৪০ হি. |
| ১৪ জমাদিউল উখরা ৫০৫ হি. | ওরস শরীফ : হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ | মাসিক ফয়যানে মদীনা জমাদিউল উখরা ১৪৩৯ হি. এবং "ফয়যানে ইমাম গাজ্জালী" |
| ১৯ জমাদিউল উখরা ১৩৮২ হি. | ওফাত দিবস: খলীফায়ে আলা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুদ্দীন রযবী বিহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ | মাসিক ফয়যানে মদীনা জমাদিউল উখরা ১৪৩৮ হি. |
| ২২ জমাদিউল উখরা ১৩ হি. | ওরস শরীফ : মুসলমানদের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ | **মাসিক ফয়যানে মদীনা জমাদিউল উখরা ১৪৩৮ থেকে ১৪৪৫ হি. এবং "ফয়যানে সিদ্দীক্বে আকবর"** |
| ২৪ জমাদিউল উখরা ১৩৭৫ হি. | ওফাত দিবস: তাজুল ওলামা হযরত সাইয়্যিদ শাহ আওলাদে রাসূল মুহাম্মদ মিয়াঁ মারাহরাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ | মাসিক ফয়যানে মদীনা জমাদিউল উখরা ১৪৩৮ হি. |
| ২৬ জমাদিউল উখরা ৪১০ হি. | ওফাত দিবস: হযরত শায়খ আবুল ফজল আব্দুল ওয়াহিদ তামীমী হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ | মাসিক ফয়যানে মদীনা জমাদিউল উখরা ১৪৩৮ হি. |
| জমাদিউল উখরা ৩৬ হি. | পবিত্র শাহাদাত: হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا | **আল মদীনাতুল ইলমিয়ার ২টি পুস্তিকা: (১) "হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ" (২) "হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম"** |

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের ক্ষমা হোক বিনা হিসাবে। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"মাসিক ফয়যানে মদীনা"-এর সংখ্যাসমূহ দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড করে পাঠ করুন এবং অন্যদের সাথে শেয়ারও করুন।

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭১৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com. Maktaba Tul Madina Bangladesh